ফাযায়েলে আমাল

মূল লেখক

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা
মুহাম্মদ যাকারিয়্যা ছাহেব কান্ধলভী (রহঃ)

অনুবাদ

মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ

মুহাদ্দিস, জামেয়া আরাবিয়াহ, ফরিদাবাদ
খতীব, সিদ্দিক বাজার জামে মসজিদ, ঢাকা।

নজরে ছানী ও সম্পাদনা

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের ছাহেব
মাওলানা রবিউল হক ছাহেব

কাকরাইল মসজিদ, ঢাকা।



দারুল কিতাব

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

মুরুব্বীগণের
দোয়া ও অভিমত

● আল্লাহ তায়ালার খাছ মেহেরবানী ও অশেষ রহমতে দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পর হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়্যা (রহঃ)এর 'ফাযায়েলে আমাল' কিতাবের পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ তরজমা প্রকাশিত হইল। জনাব মুফতী উবায়দুল্লাহ ছাহেব ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন অতঃপর মাওলানা হাফেজ যুবায়ের ও মাওলানা রবিউল হক ছাহেবান আদ্যোপান্ত মূলের সহিত ইহাকে মিলাইয়াছেন এবং প্রয়োজনীয় স্থানসমূহে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও মূলানুগ করিবার ব্যাপারে রাত্র–দিন যথেষ্ট মেহনত করিয়াছেন।

দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা উক্ত মেহনতকে আখেরাতের যখীরা হিসাবে কবূল করুন এবং বিশ্বের বাংলাভাষী সকল মুসলমানকে ইহা দ্বারা উপকৃত হওয়ার তওফীক দান করুন। আমীন।

(মোঃ সিরাজুল ইসলাম, কাকরাইল মসজিদ)
৩৭৭–বি, খিলগাঁও আবাসিক এলাকা, ঢাকা–১২১৯

● আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানীতে শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা ছাহেব (রহঃ)এর 'ফাযায়েলে আমাল' কিতাবখানির তরজমা বাংলাভাষায় পুরাপুরিভাবে করা হইল। হাজী আবদুল মুকীত ছাহেব (রহঃ)এর একান্ত আগ্রহ ও আদেশে মুফতী উবাইদুল্লাহ ছাহেব ইহার যথাযথ তরজমা করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন ও পুরা উম্মতকে ইহা দ্বারা উপকৃত করুন, আমীন।

(মাহমুদুল হক)
কাকরাইল মসজিদ, ঢাকা।

● আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানীতে শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা ছাহেব (রহঃ)এর 'ফাযায়েলে আমাল' কিতাবখানির মোকাম্মাল বাংলা তরজমা প্রকাশিত হইল। হাজী আবদুল মুকীত ছাহেব (রহঃ)এর একান্ত আগ্রহ ও হুকুমে তাঁহারই হেদায়াত মোতাবেক মুফতী উবাইদুল্লাহ ছাহেব ইহার তরজমা করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার এই মেহনতকে কবুল করুন এবং উম্মতকে ইহা দ্বারা উপকৃত হওয়ার তওফীক দান করুন, আমীন।

(সৈয়দ আজিজুল মকছুদ)
৬৫নং কুদরতে খোদা রোড, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

অনুবাদকের আরজ

আলহামদুলিল্লাহ! শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা (রহঃ) রচিত ঈমান আমল ও দাওয়াত–তবলীগের জজবা পয়দাকারী মশহুর কিতাব 'ফাযায়েলে আমাল' এর পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইল। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থকার হযরত শায়েখ (রহঃ)এর দেওয়া মৌল নীতি ও দিকনির্দেশনার যথাযথ অনুসরণ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হইয়াছে। তিনি যে নীতিমালা দিয়াছেন তাহা হইল—

اسی طرح دوسرے مختلف زبانوں میں ترجمہ کرنے والوں پر اس کی پوری پوری ذمہ داری ہے کہ وہ ترجمہ کرتے وقت اصل مضمون کو نہ بدلیں اور نہ ہی اپنی طرف سے کچھ اضافہ کریں۔ مقدمہ تبلیغی نصاب

হযরত হাজী আবদুল মুকীত ছাহেব (রহঃ)এর সরাসরি নির্দেশ, দিলি তামান্না ও ঐকান্তিক আগ্রহই কিতাবখানি তরজমার ক্ষেত্রে আমাকে অনুপ্রেরণা ও সাহস জোগাইয়াছে। ইন্তিকালের তিন মাস পূর্বেও তিনি এই বলিয়া বিশেষ তাম্বীহ ও খাছ হেদায়েত দিয়াছেন যে, তরজমা এমন সরল সহজ হইতে হইবে যেন সাধারণ মানুষ অনায়াসেই পড়িতে ও তালীম করিতে পারে।

আল্লাহ পাক জাযায়ে খায়ের দান করুন হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের ছাহেব ও মাওলানা রবিউল হক ছাহেবকে, তাঁহারা কাকরাইলের বর্তমান মুরুব্বীগণের মানশা মোতাবেক পাণ্ডুলিপির আগাগোড়া মূল কিতাবের সহিত অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জন করিয়া দিয়াছেন।

কাকরাইলের সকল আহলে শূরা, আকাবেরীন, অন্যান্য মুরুব্বিয়ান ও দোস্ত–আহবাবের নিকট আমি শোকর গুজার যে, তাঁহারা খাছ দোয়া ও তাওয়াজ্জুহ দ্বারা আমাকে হিম্মত দিয়াছেন। আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজানও ইহার জন্য আন্তরিক দোয়া করিয়াছেন। আল্লাহ পাক দোজাহানে তাঁহাদিগকে বহুত বহুত জাযায়ে খায়ের দান করুন ও দরজা বুলন্দ করুন। কিতাবখানির তরজমা ও প্রকাশের ব্যাপারে যে সকল আহবাব আমাকে সহযোগিতা করিয়াছেন আল্লাহ পাক তাঁহাদেরকেও উভয় জাহানে উত্তম বদলা দান করুন।

পাঠকবর্গের খেদমতে সবিনয় আবেদন যে, কোনপ্রকার ভুল–ত্রুটি ধরা পড়িলে জানাইয়া কৃতার্থ করিবেন। পরবর্তীতে সংশোধন করিয়া দেওয়া হইবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে মিনতি পেশ করিতেছি, তিনি যেন আপন দয়ায় কিতাবখানি কবূল করিয়া নেন এবং ইহাকে সকল উম্মতের আমল, হেদায়েত ও নাজাতের ওসীলা হিসাবে কবুল ফরমান।

—বিনীত অনুবাদক।

সূচীপত্র
ফাযায়েলে তবলীগ

॥ ॥ ॥



نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

ভূমিকা

হামদ ও সালাতের পর। মুজাদ্দেদীনে ইসলাম ও যমানার ওলামা-মাশায়েখের উজ্জ্বল রত্ন (হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রহঃ) আমাকে তবলীগে দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আয়াত ও হাদীস লিখিয়া পেশ করিতে আদেশ করেন। এইরূপ বুযুর্গগণের সন্তুষ্টি হাসিল করা আমার মত গোনাহগারের জন্য গোনাহ-মাফী ও নাজাতের ওসীলা—এই আশায় দ্রুত রচনা করতঃ এই উপকারী কিতাবখানি খেদমতে পেশ করিতেছি। সেইসঙ্গে প্রত্যেক দ্বীনি মাদরাসা, দ্বীনি আঞ্জুমান, ইসলামী আদর্শে পরিচালিত স্কুল, প্রতিটি ইসলামী শক্তি বরং প্রত্যেক মুসলমানের নিকট আরজ করিতেছি যে, বর্তমানে দ্বীনের অবনতি যেভাবে দিন দিন বাড়িতেছে, বিধর্মীদের পক্ষ হইতে নয় স্বয়ং মুসলমানদের পক্ষ হইতে দ্বীনের উপর যেভাবে হামলা হইতেছে, ফরজ ও ওয়াজিবসমূহের উপর আমল সাধারণ মুসলমানদের হইতে নয় বরং খাছ লোকদের এমনকি যাহারা আরও বিশিষ্ট তাহাদেরও ছুটিয়া যাইতেছে। নামায-রোযা ত্যাগ করার বিষয় কি বলিব যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রকাশ্য কুফর ও শির্কে লিপ্ত রহিয়াছে। সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হইল যে, তাহারা ইহাকে শির্ক ও কুফ্র বলিয়া মনে করে না। যাবতীয় হারাম, নাফরমানী ও অশ্লীলতার প্রচলন যেরূপ প্রকাশ্যে ও স্পষ্টভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং দ্বীনের প্রতি বে-পরওয়া ভাব, বরং অবজ্ঞা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ যে পরিমাণ ব্যাপক হইতেছে তাহা কোন ব্যক্তির নিকট এখন আর অস্পষ্ট নয়। এইসব কারণেই বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম বরং সাধারণ আলেমগণের মধ্যেও লোকদের হইতে বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই দাঁড়াইতেছে যে, দ্বীন এবং দ্বীনি বিষয়াবলী হইতে বিচ্ছিন্নতা দিন দিন আরও বাড়িতেছে। জনসাধারণ এই বলিয়া নিজেদেরকে অক্ষম মনে করিতেছে যে, তাহাদেরকে বুঝানোর কেহ নাই,

আবার আলেমগণও এই বলিয়া নিজেদেরকে নির্দোষ মনে করিতেছেন যে, তাহাদের কথা শুনিবার মত কেহ নাই। কিন্তু সাধারণ লোকের 'বুঝানোর কেহ নাই' এই আপত্তি আল্লাহ তায়ালার দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকের নিজস্ব দায়িত্ব। আইন না জানার আপত্তি কোন সরকারের নিকটই গ্রহণযোগ্য নয় ; আহকামুল হাকেমীনের দরবারে এই অহেতুক ওজর কিরূপে গ্রহণযোগ্য হইবে। বরং গোনাহের পক্ষে ওজর পেশ করা গোনাহে লিপ্ত হওয়া হইতে আরও নিকৃষ্ট।

তদ্রূপ, আলেমগণের এই ওজর-আপত্তিও সঠিক নয় যে, 'আমাদের কথা শুনিবার কেহ নাই।' কারণ, যে সকল মহাপুরুষের প্রতিনিধিত্বের দাবী আপনারা করিতেছেন, দ্বীন পৌঁছানোর জন্য তাঁহারা কি কোন কষ্ট ভোগ করেন নাই? তাঁহারা কি পাথরের আঘাত সহ্য করেন নাই? শত গালি ও কটুবাক্য শুনেন নাই? মুসীবত বরদাশ্‌ত করেন নাই? বরং সব ধরণের কষ্ট-তকলীফ সহ্য করিয়া শুধুমাত্র দ্বীন পৌঁছানোর দায়িত্ব অনুভব করিয়া মানুষের নিকট দ্বীন পৌঁছাইয়াছেন। কঠিন হইতে কঠিনতর বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও নেহায়েত স্নেহ-মহব্বতের সহিত তাঁহারা ইসলাম ও ইসলামের হুকুমসমূহ প্রচার করিয়াছেন।

সাধারণভাবে মুসলমানগণ দ্বীনের তবলীগকে ওলামায়ে কেরামেরই দায়িত্ব বলিয়া মনে করিয়া নিয়াছে ; অথচ ইহা ঠিক নয়। বরং প্রত্যেক ব্যক্তি যাহার সম্মুখে অন্যায় কাজ সংঘটিত হইতেছে সরাসরি বাধা প্রদান করার শক্তি থাকিলে কিংবা ব্যবস্থা নিতে পারিলে বাধা প্রদান করা তাঁহার উপর ওয়াজিব। আর যদি মানিয়া লওয়া হয় যে, ইহা ওলামাদের দায়িত্ব, তবুও যখন তাহারা স্বীয় দুর্বলতা অথবা কোন বাধ্য-বাধকতার কারণে এই দায়িত্ব পুরা করিতেছেন না অথবা তাহাদের দ্বারা পুরা হইতেছে না তখন এই দায়িত্ব প্রত্যেকের উপর বর্তাইবে। কুরআন ও হাদীসে যেভাবে গুরুত্বের সহিত তবলীগ এবং সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ সম্পর্কে বলা হইয়াছে, তাহা এই সকল আয়াত ও হাদীস দ্বারা যাহা সামনের পরিচ্ছেদে আসিতেছে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

এমতাবস্থায় শুধু আলেমদের উপর ছাড়িয়া দিয়া কিংবা তাঁহাদের অবহেলা ও ত্রুটির কথা বলিয়া কেহ দায়িত্বমুক্ত হইতে পারিবে না।

অতএব, সকলের নিকট আমার আবেদন যে, এই সময় প্রত্যেক মুসলমানকেই তবলীগে কিছু না কিছু অংশ নেওয়া উচিত এবং দ্বীন প্রচার ও হেফাজতের কাজে যে পরিমাণ সময়ই ব্যয় করা যায় উহা করা উচিত।

(কবির ভাষায়—)

ہر وقت خوش کہ دست دہد مغتنم شمار
کس را وقوف نیست کہ انجام کار چیست

অর্থাৎ, সময়-সুযোগ যতটুকু হাতে আসে উহাকে কদর করা উচিত, কারণ পরিণাম কি, তাহা কাহারও জানা নাই।

ইহাও জানিয়া রাখা দরকার যে, তবলীগের জন্য বা সৎকাজে আদেশ ও মন্দকাজে নিষেধের জন্য পরিপূর্ণ ও যোগ্য আলেম হওয়া জরুরী নয়। যে ব্যক্তি দ্বীনের যে কোন মাসআলা জানে তাহা অন্যদের কাছে পৌঁছাইবে। যখন তাহার সামনে কোন নাজায়েয কাজ হইতে থাকে যদি বাধা দেওয়ার শক্তি থাকে, তবে উহাতে বাধা দেওয়া তাহার উপর ওয়াজিব।

এই কিতাবে সংক্ষিপ্ত আকারে সাতটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছি।



ফাযায়েলে তবলীগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বরকতের জন্য আমি আল্লাহ তায়ালার বরকতময় কালাম হইতে কিছু আয়াত তরজমা সহ পেশ করিতেছি। এই আয়াতসমূহে সৎকাজে আদেশ করা সম্পর্কে তাকিদ ও উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা অনুমান করা যাইবে যে, আল্লাহর দরবারে এই কাজের এহ্তেমাম ও গুরুত্ব কত বেশী! যে কারণে নিজ কালামে পাকে বারবার বিভিন্নভাবে ইহাকে উল্লেখ করিয়াছেন। তবলীগের ফযীলত ও উৎসাহ প্রদান সম্পর্কে প্রায় ষাটটি আয়াত আমার ক্ষুদ্র নজরে পড়িয়াছে। যদি কোন সূক্ষ্মদর্শী গভীরভাবে চিন্তা করেন তবে নাজানি এই বিষয়ে তিনি আরও কত আয়াত পাইবেন। সমস্ত আয়াত জমা করিলে কিতাব অনেক দীর্ঘ হইয়া যাইবে বলিয়া মাত্র কয়েকটি আয়াত এখানে পেশ করিতেছি ঃ

(1) قَالَ اللّٰهُ عَزَّ اِسْمُهٗ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○ (پ۲۴۔ رکوع ۱۹)

اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلاتے اور نیک عمل کرے، اور کہے کہ میں فرماں برداروں میں سے ہوں (بیان القرآن)

(১) ঐ ব্যক্তির কথা হইতে উত্তম কথা আর কাহার হইতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং নিজে নেক আমল করে ও বলে যে, নিশ্চয় আমি মুসলমানদের মধ্য হইতে একজন।

(সূরা হা–মিম সিজদাহ, আয়াত ঃ ৩৩) (বয়ানুল কুরআন)

মুফাস্সিরগণ লিখিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি যে কোন পন্থায় মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকিবে, সে উপরোক্ত সুসংবাদ ও প্রশংসার উপযুক্ত

হইবে। যেমন, আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) মুজেযা ইত্যাদির দ্বারা, ওলামায়ে কেরাম দলীল-প্রমাণের দ্বারা, মুজাহিদগণ তলোয়ারের দ্বারা, মুআয্যিনগণ আযানের দ্বারা আল্লাহর দিকে ডাকিয়া থাকেন।

মোটকথা, যে কোন ব্যক্তি কাহাকেও মঙ্গলের দিকে আহ্বান করিবে সেই উক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হইবে। চাই জাহেরী আমলের দিকে আহবান করুক কিংবা বাতেনী আমলের দিকে আহবান করুক, যেমন মাশায়েখ সূফীগণ মানুষকে আল্লাহর মারেফাতের দিকে ডাকেন।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ আরও লিখিয়াছেন—

قَالَ اِنَّنِیۡ مِنَ الۡمُسۡلِمِیۡنَ 'আমি মুসলমানদের মধ্য হইতে একজন' দ্বারা এই আয়াতের মধ্যে এইদিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, মুসলমান হওয়ার কারণে গৌরবান্বিত হওয়া উচিত, ইহাকে ইজ্জত ও সম্মানের বিষয় বলিয়া মনে করা উচিত এবং এই ইসলামী বৈশিষ্ট্যকে গৌরবের সহিত উল্লেখও করা উচিত।

কোন কোন মুফাস্সির ইহাও বলিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হইল, ওয়াজ-নসীহত ও তবলীগ করার কারণে কেহ যেন নিজেকে অনেক বড় কিছু মনে না করে ; বরং সে যেন ইহা বলে যে, 'সাধারণ মুসলমানগণের মধ্যে আমিও একজন।'

(২) وَذَكِّرۡ فَاِنَّ الذِّكۡرٰى تَنۡفَعُ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ۝

(پ ۲۷۔ رکوع ۲)

اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) لوگوں کو سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔

(২) হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি লোকদেরকে নসীহত করিতে থাকুন, কেননা নসীহত মুমিনদেরকে ফায়দা পৌঁছাইবে। (সূরা যারিয়াত, আয়াত ঃ ৫৫)

মুফাস্সিরগণ লিখিয়াছেন, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল কুরআন শরীফের আয়াত শুনাইয়া নসীহত করা। কেননা এইরূপ নসীহত উপকারী হইয়া থাকে। মুমিনদের জন্য উপকারী হওয়া তো স্পষ্ট ; কাফেরদের জন্যও উহা উপকারী। এই হিসাবে যে, নসীহতের বরকতে তাহারা ইনশাআল্লাহ মুমিনদের মধ্যে দাখিল হইয়া উক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে।

বর্তমান যুগে ওয়াজ-নসীহতের পথ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে ; সাধারণতঃ শ্রোতার প্রশংসা লাভের জন্য প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করা উদ্দেশ্য হইয়া গিয়াছে। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য

ভাষা-পাণ্ডিত্য ও বক্তৃতা শিখে কিয়ামতের দিন তাহার ফরজ ও নফল কোন এবাদত গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৩) وَاْمُرۡ اَهۡلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصۡطَبِرۡ عَلَيۡهَا ؕ لَا نَسۡـَٔلُكَ رِزۡقًا ؕ نَحۡنُ نَرۡزُقُكَ ؕ وَالۡعَاقِبَةُ لِلتَّقۡوٰى۝

(پ ۱۶۔ رکوع ۱۷)

اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہئے اور خود بھی اس کے پابند رہئے ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے معاش تو آپ کو ہم دیں گے اور بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔

(৩) হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি আপনার পরিবার-পরিজনকে নামাযের হুকুম করিতে থাকুন এবং নিজেও উহার পাবন্দি করুন। আমি আপনার নিকট রিযিক চাহি না বরং রিযিক আপনাকে আমিই দিব আর উত্তম পরিণতি তো পরহেজগারীর জন্যই।

(সূরা ত্বাহা, আয়াত ঃ ১৩২)

বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন কাহারও রুজির অভাব দূর করিবার চিন্তা হইত তখন তাহাকে নামাযের তাকিদ করিতেন এবং উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিয়া এই কথা বুঝাইতেন যে, রিযিকের প্রশস্ততার ওয়াদা গুরুত্ব সহকারে নামায আদায়ের উপর নির্ভর করে।

ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, উক্ত আয়াত শরীফে নামাযের হুকুম করার সাথে নিজেও যেন নামাযের পাবন্দি করে ইহার হুকুম এইজন্য দেওয়া হইয়াছে যে, ইহাতে উপকার বেশী হয়। তবলীগের সাথে সাথে অন্যদেরকে যে জিনিসের হুকুম করা হয় নিজে উহার উপর আমল করিলে অধিক কার্যকরী হয় এবং অন্যদেরকেও আমলের প্রতি যত্নবান হওয়ার কারণ হয়। এই জন্যই আল্লাহ তায়ালা আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস-সালামকে নমুনাস্বরূপ পাঠাইয়াছেন। যাহাতে লোকদের জন্য আমল করা সহজ হয় এবং কাহারও যেন এই ভয় না থাকে যে, অমুক হুকুম কঠিন ; উহার উপর কিভাবে আমল করিব।

অতঃপর উক্ত আয়াতে রিযিকের ওয়াদা করার কারণ এই যে, সময়মত নামায আদায় করিতে গেলে অনেক সময় রুজি-রোজগার

বিশেষতঃ ব্যবসা ও চাকুরীর ক্ষতি হয় বলিয়া মনে হয়। এইজন্য সাথে সাথে সন্দেহ দূর করিয়া দিলেন যে, ইহা আমার জিম্মায়। এইসব ওয়াদা দুনিয়াবী বিষয়সমূহের ব্যাপারে করা হইয়াছে। অতঃপর আখেরাতের ব্যাপারে আয়াতের শেষাংশে সাধারণ নিয়ম ও স্পষ্ট বিষয় হিসাবে বলিয়া দিয়াছেন যে, আখেরাতের সুফল ও পুরস্কার তো একমাত্র পরহেজগার ব্যক্তিদের জন্যই ; ইহাতে অন্য কাহারও অংশই নাই।

(٤) يَابُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ ۖ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝ (پ ۲۱ ۔ ع ۱۱)

بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور بُرے کاموں سے منع کیا کر اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ (بیان القرآن)

④ হে বৎস ! নামায পড়িতে থাক, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিতে থাক এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে উহাতে ধৈর্য ধারণ কর। নিঃসন্দেহে ইহা হিম্মতের কাজ।

(সূরা লুকমান, আয়াত ঃ ১৭) (বয়ানুল কুরআন)

এই আয়াতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং যাবতীয় কামিয়াবীর চাবিকাঠি। কিন্তু আমরা এই বিষয়গুলিকেই বিশেষভাবে পিছনে ফেলিয়া রাখিয়াছি। সৎকাজের আদেশ সম্পর্কে তো বলাই বাহুল্য ; উহা তো প্রায় সকলেই ছাড়িয়া দিয়াছি। নামায যাহা সকল এবাদতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ঈমানের পর যাহার স্থান সর্বাগ্রে উহার প্রতিও কি পরিমাণ অবহেলা প্রদর্শন করা হয়। যাহারা নামায পড়ে না তাহাদের কথা বাদ দিলেও স্বয়ং নামাযী লোকেরাও উহার প্রতি পুরাপুরি গুরুত্ব দেয় না ; বিশেষ করিয়া জামাতের প্রতি। নামায কায়েম করা দ্বারা জামাতের সহিত নামায আদায় করার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। উহা কেবল গরীবদের জন্য রহিয়া গিয়াছে ; ধনী ও সম্মানী লোকদের জন্য মসজিদে যাওয়া যেন একটি লজ্জার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকল অভিযোগ একমাত্র আল্লাহর দরবারে। (কবি বলেন—)

ع آنچہ عار تست آن فخر من است

অর্থাৎ ঃ তোমার জন্য যাহা লজ্জার বিষয় আমার জন্য উহা গৌরবের বিষয়।

(٥) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۖ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ (پ ۴ ۔ ع ۲)

اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلاتے اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کرے اور بُرے کاموں سے روکا کرے اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔

⑤ তোমাদের মধ্য হইতে একটি জামাত এমন হওয়া জরুরী ; যাহারা মঙ্গলের দিকে আহবান করিবে, সৎকাজে আদেশ করিবে ও অসৎকাজে নিষেধ করিবে তাহারাই পূর্ণ কামিয়াব হইবে।

(সূরা আলি ইমরান, আয়াত ঃ ১০৪)

আল্লাহ পাক এই আয়াতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের নির্দেশ দান করিয়াছেন। উহা এই যে, উম্মতের মধ্যে একটি জামাত বিশেষভাবে এই কাজের জন্য থাকিতে হইবে, যাহারা ইসলামের দিকে লোকদিগকে তবলীগ করিবে। এই হুকুম মুসলমানদের জন্য ছিল। কিন্তু আফসোসের বিষয় যে, এই বুনিয়াদি কাজকে আমরা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছি। অথচ বিধর্মীরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। খৃষ্টানদের স্বতন্ত্র দলসমূহ দুনিয়াব্যাপী তাহাদের ধর্ম প্রচারের জন্য নির্দিষ্ট রহিয়াছে, অনুরূপভাবে অন্যান্য জাতির মধ্যেও এই কাজের জন্য নির্ধারিত কর্মী রহিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইল মুসলমানদের মধ্যেও কি এইরূপ নির্দিষ্ট কোন জামাত আছে? ইহার উত্তরে 'নাই' না বলিলেও 'আছে' বলাও মুশকিল। বরং কোন জামাত বা ব্যক্তি যদি এই কাজের জন্য দাঁড়ায়ও তবে সাহায্য ও সহযোগিতার পরিবর্তে তাহাদের বিরুদ্ধে নানা ধরণের প্রশ্ন উঠাইয়া এমন চাপ সৃষ্টি করা হয় যে, শেষ পর্যন্ত তাহারা ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়ে। অথচ এইকাজে সাহায্য ও সহানুভূতি করা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলে উহার সংশোধন করাই ছিল প্রকৃত হিতকামনা। পক্ষান্তরে, নিজে কোন কাজ না করিয়া যাহারা করে তাহাদের বিরুদ্ধে নানা প্রশ্ন ও অভিযোগ উঠানো কাজ হইতে তাহাদিগকে ফিরাইয়া রাখারই নামান্তর।

(٦) كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ

تم بہترین اُمت ہو کہ لوگوں کے نفع رسانی کے لئے نکالے گئے ہو۔ تم لوگ نیک کام

عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ
(پ۴ - ع ۳)

کا حکم کرتے ہو اور برے کام سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔
(بیان القرآن وترجمہ عاشقی)

(৬) তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের (মঙ্গলের) জন্য তোমাদিগকে বাহির করা হইয়াছে। তোমরা সৎকাজে আদেশ করিয়া থাক এবং অসৎকাজ হইতে নিষেধ করিয়া থাক এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখ।

(সূরা আলি ইমরান, আয়াত ঃ ১১০, বয়ানুল কুরআন ও তরজমায়ে আশেকী)

মুসলমান সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি এবং উম্মতে মুহাম্মদী সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত—এই কথা বিভিন্ন হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কুরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতেও এই বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে কিংবা ইঙ্গিত আকারে বর্ণনা করা হইয়াছে।

উপরোক্ত আয়াতেও শ্রেষ্ঠ উম্মত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে এবং ইঙ্গিতে ইহার কারণও উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত এই জন্য যে, তোমরা 'আমর বিল–মারূফ ও নাহী আনিল–মুনকার' অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করিয়া থাক।

মুফাস্সিরগণ লিখিয়াছেন, এই আয়াত শরীফে 'আমর বিল–মারূফ ও নাহী আনিল–মুনকার'কে ঈমানের পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে অথচ ঈমান হইল সকল এবাদতের মূল ; ঈমান ব্যতীত কোন ভাল কাজই গ্রহণযোগ্য নয়। ইহার তাৎপর্য এই যে, ঈমানের ব্যাপারে তো পূর্ববর্তী অন্যান্য উম্মতও শরীক রহিয়াছে ; কিন্তু যে বৈশিষ্ট্যের কারণে উম্মতে মুহাম্মদীকে সমস্ত নবীগণের অনুসারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে উহা একমাত্র আমর বিল–মারূফ ও নাহী আনিল–মুনকার, যাহা এই উম্মতের স্বাতন্ত্র্যের বিশেষ চিহ্নস্বরূপ। আর যেহেতু ঈমান ব্যতীত কোন নেক আমল গ্রহণযোগ্য নয় সেইজন্য সাথে সাথেই শর্তস্বরূপ উহাকেও উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন। নতুবা এই আয়াতের আসল উদ্দেশ্য 'আমর বিল–মারূফ ও নাহী আনিল–মুনকার' বিষয়টি উল্লেখ করা, আর যেহেতু উহাই এখানে আলোচনার বিষয় কাজেই উহাকে আগে উল্লেখ করা হইয়াছে।

'এই উম্মতের জন্য স্বাতন্ত্র্যের বিশেষ চিহ্ন' হওয়ার অর্থ হইল বিশেষভাবে গুরুত্বসহকারে এই কাজ করিতে হইবে ; শুধুমাত্র চলাফেরার মধ্য দিয়া কিছু তবলীগ করিয়া নিলে যথেষ্ট হইবে না। কেননা, এইরূপ সংক্ষিপ্ত তবলীগ তো পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যেও পাওয়া যাইত।

যেমন— فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ ইত্যাদি আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সুতরাং বিশেষভাবে গুরুত্বসহকারে অন্যান্য দ্বীনি কাজের মত স্বতন্ত্র কাজ মনে করিয়া এই কাজে মশগুল হওয়াই এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য।

(৭) لَاخَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۢ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ○
(پ۵ رکوع ۱۴)

عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر (وبرکت) نہیں ہوتی مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ صدقہ خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں (اور اس تعلیم وترغیب کے لئے خفیہ تدبیریں اور مشورے کرتے ہیں اُن کے مشوروں میں البتہ خیر وبرکت ہے) اور جو شخص یہ کام (یعنی نیک اعمال کی ترغیب محض اللہ کی رضا کے واسطے کریگا (نہ کہ لالچ یا شہرت کی غرض سے) اس کو ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔

(৭) "সাধারণ লোকদের অধিকাংশ সলা–পরামর্শের মধ্যে কোন খায়ের (বরকত) নাই, তবে যাহারা দান–খয়রাত বা কোন নেক কাজ কিংবা মানুষের পরস্পর সংশোধনের জন্য উৎসাহ প্রদান করে (এবং এই তালীম ও তারগীবের জন্য গোপনে চেষ্টা–তদবীর ও পরামর্শ করে) তাহাদের পরামর্শের মধ্যে অবশ্যই খায়র–বরকত আছে। আর যাহারা (ভাল কাজে উৎসাহ প্রদানের) এই কাজ (লোভ–লালসা ও সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্য ব্যতীত) শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই করে, তাহাদিগকে আমি অতি সত্বর বিরাট পুরস্কার দান করিব।" (সূরা নিসা, আয়াত ঃ ১১৪)

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সৎকাজে আহ্বানকারীদের জন্য বিরাট পুরস্কারের ওয়াদা করিয়াছেন। আর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যে পুরস্কারকে বিরাট বলিয়াছেন, উহার কি কোন সীমা থাকিতে পারে? এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নকল করা হইয়াছে যে, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ এবং আল্লাহর যিকির ব্যতীত মানুষের প্রত্যেক কথা তাহার জন্য বোঝা হইবে।

আরও বহু হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে, আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস বলিয়া দিব না যাহা নফল নামায, রোযা, দান–খয়রাত ইত্যাদি হইতে উত্তম? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, অবশ্যই! বলিয়া দিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, মানুষের মধ্যে পরস্পর

ঝগড়া-বিবাদ মিটাইয়া দেওয়া। কেননা, পরস্পর কলহ নেকীসমূহকে এমনভাবে ধ্বংস করিয়া দেয়, যেমন ক্ষুর চুলকে সাফ করিয়া দেয়।

পরস্পর কলহ-বিবাদ মিটানোর বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে আরও বহু জায়গায় গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সেইগুলি উল্লেখ করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। এখানে উদ্দেশ্য হইল, সৎকাজে আদেশের অন্তর্ভুক্ত যে কোন পন্থা অবলম্বন করিয়া সম্ভব হয় পরস্পর কলহ বিবাদ মিটানোর ব্যাপারে অবশ্যই যেন চেষ্টা করা হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে উপরে উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে বর্ণিত কিছুসংখ্যক হাদীসের তরজমা দেওয়া হইল। বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত সকল হাদীস বর্ণনা করা উদ্দেশ্যও নয় ; সম্ভবও নয়। ইহা ছাড়াও কিছুটা অধিক পরিমাণে আয়াত ও হাদীস যদি জমা করা হয়, তবে ভয় হয় যে, এইগুলি পড়িবে কে, আজকাল এইসব বিষয় পড়ার জন্য কাহারই বা অবসর আছে আর কাহার নিকটই বা সময় আছে। কাজেই শুধু এই বিষয়টি দেখানোর জন্য এবং আপনাদের পর্যন্ত পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত বেশী গুরুত্বের সহিত এই তবলীগের কাজের প্রতি তাকীদ করিয়াছেন আর না করিলে কত কঠোর সাবধানবাণী ও ধমকি প্রদান করিয়াছেন— নিম্নে কিছুসংখ্যক হাদীস উল্লেখ করা হইতেছে ঃ

(١) عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِ نِ الْخُدْرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ مَنْ رَّاٰی مِنْکُمْ مُّنْکَرًا فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِیْمَانِ (رواہ مسلم والترمذی وابن ماجة والنسائی کذا فی الترغیب)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی ناجائز امر کو ہوتے ہوئے دیکھے اگر اس پر قدرت ہو کہ اس کو ہاتھ سے بند کر دے تو اس کو بند کر دے. اگر اتنی مقدرت نہ ہو تو زبان سے اس پر انکار کر دے اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے. اور یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے.

(১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজ হইতে দেখে, যদি হাত দ্বারা বন্ধ করিবার

শক্তি রাখে তবে উহাকে হাত দ্বারা বন্ধ করিয়া দিবে। যদি এই পরিমাণ শক্তি না রাখে তবে জবান দ্বারা উহার প্রতিবাদ করিবে। যদি এই ক্ষমতাও না থাকে তবে অন্তর দ্বারা উহাকে খারাপ মনে করিবে। আর ইহা হইল ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।(তারগীবঃ মুসলিম, তিরমিযী,ইবনে মাজাহ, নাসাঈ)

অন্য হাদীসে আছে, যদি তাহার জবান দ্বারা বন্ধ করিবার শক্তি থাকে তবে জবান দ্বারা বন্ধ করিয়া দিবে নতুবা অন্তরে উহাকে ঘৃণা করিবে। ইহাতেও সে দায়িত্বমুক্ত হইয়া যাইবে।

আরেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি অন্তরে উহাকে ঘৃণা করে সেও ঈমানদার বটে কিন্তু ইহা হইতে নিম্নে ঈমানের কোন স্তর নাই।

এই বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি এরশাদ বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। এখন উক্ত হাদীস অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারেও দেখা উচিত। আমাদের মধ্যে কতজন লোক এইরূপ আছে যে, কোন অন্যায় কাজ হইতে দেখিয়া উহাকে হাত দ্বারা বন্ধ করিয়া দেয় অথবা শুধু জবান দ্বারা উহাকে অন্যায় বলিয়া প্রকাশ করিয়া দেয় অথবা দুর্বল ঈমান হিসাবে কমপক্ষে অন্তরে উহাকে ঘৃণা করে কিংবা ঐ কাজ হইতে দেখিয়া অন্তরে ব্যথা অনুভব করে। নির্জনে বসিয়া একটু চিন্তা করুন কি হইবার ছিল আর কি হইতেছে !

(٢) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَثَلُ الْقَائِمِ فِیْ حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ فِیْهَا کَمَثَلِ قَوْمِ نِ اسْتَهَمُوْا عَلٰی سَفِیْنَةٍ فَصَارَ بَعْضُهُمْ اَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ اَسْفَلَهَا فَکَانَ الَّذِیْ فِیْ اَسْفَلِهَا اِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوْا عَلٰی مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوْا لَوْ اَنَّا خَرَقْنَا فِیْ نَصِیْبِنَا خَرْقًا وَّلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَاِنْ تَرَکُوْهُمْ وَمَا اَرَادُوْا هَلَکُوْا جَمِیْعًا وَّاِنْ اَخَذُوْا عَلٰی اَیْدِیْهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِیْعًا (رواہ البخاری والترمذی)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود پر قائم ہے اور اس شخص کی جو اللہ کی حدود میں پڑنے والا ہے اس قوم کی سی ہے جو ایک جہاز میں بیٹھے ہوں اور قرعہ سے (مثلاً) جہاز کی منزلیں مقرر ہو گئی ہوں کہ بعض لوگ جہاز کے اوپر کے حصہ میں ہوں اور بعض لوگ نیچے (طبق) کے حصہ میں ہوں جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جہاز کے اوپر کے حصہ پر آ کر پانی لیتے ہیں اگر وہ یہ خیال کر کے کہ ہمارے بار بار اوپر پانی کے لئے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے ہم اپنے ہی حصہ میں

یعنی جہاز کے نیچے کے حصہ میں ایک سوراخ سمندر میں کھول لیں جس سے پانی یہاں ہی ملتا رہے اوپر والوں کو ستانا نہ پڑے ایسی صورت میں اگر اوپر والے ان احمقوں کی اس تجویز کو نہ روکیں گے اور خیال کر لیں گے کہ وہ جانیں ان کا کام ہمیں اُن سے کیا واسطہ تو اس صورت میں وہ جہاز غرق ہو جائے گا اور دونوں فریق ہلاک ہو جائیں گے اور اگر وہ ان کو روک دیں گے تو دونوں فریق ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔

(২) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমারেখার ভিতরে রহিয়াছে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করে তাহাদের দৃষ্টান্ত ঐ লোকদের মত যাহারা এক জাহাজের যাত্রী এবং লটারীর মাধ্যমে জাহাজের শ্রেণী নির্ধারিত হইয়াছে। কিছুলোক উপর তলায় আছে আর কিছু লোক নীচতলায় আছে। নীচতলাবাসীদের পানির প্রয়োজন হইলে উপর তলায় যাইয়া পানি আনিতে হয়। যদি তাহারা ইহা মনে করে যে, আমাদের বারবার যাওয়া–আসার কারণে উপর তলাবাসীদের কষ্ট হয়, অতএব আমরা যদি আমাদের অংশে অর্থাৎ জাহাজের নীচ দিয়া সমুদ্রে একটি ছিদ্র করিয়া লই, তবে পানি এইখানেই পাওয়া যাইবে ; উপর তলাবাসীদের কষ্ট দিতে হইবে না। এমতাবস্থায় উপর তলার লোকেরা যদি নীচতলার আহমকদিগকে এই কাজে বাধা না দেয় আর মনে করে যে, তাহাদের কাজ তাহারা বুঝিবে তাহাদের সহিত আমাদের কি সম্পর্ক ; তাহা হইলে জাহাজ ডুবিয়া যাইবে এবং উভয় দল ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর যদি তাহাদিগকে বাধা দেয় তবে উভয় দল ডুবিয়া যাওয়া হইতে রক্ষা পাইবে। (বুখারী, তিরমিযী)

একদা সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে নেক্‌কার ও পরহেজগার লোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হইতে পারি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হাঁ, পাপকাজ যখন অতিমাত্রায় হইবে।

বর্তমানে চতুর্দিকে মুসলমানদের অধঃপতন ও বরবাদীর গীত গাওয়া হইতেছে ইহার আওয়াজ তোলা হইতেছে এবং তাহাদের সংশোধনের জন্য নূতন নূতন পথ ও পন্থার প্রস্তাব পেশ করা হইতেছে। কিন্তু (আধুনিক শিক্ষার ভক্ত) কোন নব্য চিন্তাধারার লোক তো দূরের কথা কোন পুরাতন চিন্তাধারার আলেম লোকেরও এই দিকে নজর যায় না যে, প্রকৃত

চিকিৎসক দয়ার নবী কি রোগ সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং কি চিকিৎসা বাতলাইয়াছেন এবং সেই অনুযায়ী কতটুকু আমল করা হইতেছে। এই জুলুমের কি কোন সীমা আছে যে, যাহা রোগ উৎপত্তির কারণ ; যে কারণে রোগ দেখা দিয়াছে উহাই চিকিৎসা হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে। (অর্থাৎ দ্বীন ও দ্বীনের বিধানসমূহকে উপেক্ষা করিয়া নিজের মনগড়া চিন্তাধারার মাধ্যমে দ্বীনের উন্নতি কামনা করা হইতেছে)। এমতাবস্থায় এই রোগী আগামীকালের পরিবর্তে আজই মারা যাইবে না, তো কি হইবে?

ے میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب
اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں

মীর! দেখ, কত সরল! যে ডাক্তারের ঔষধে অসুস্থ হইয়াছে তাহার পুত্রের নিকট হইতেই ঔষধ লইতেছে।

(۳) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلٰى بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ اَنَّهٗ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُوْلُ يَا هٰذَا اِتَّقِ اللّٰهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ بِهٖ فَاِنَّهٗ لَا يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ وَهُوَ عَلٰى حَالِهٖ فَلَا يَمْنَعُهٗ ذٰلِكَ اَنْ يَّكُوْنَ اَكِيْلَهٗ وَشَرِيْبَهٗ وَقَعِيْدَهٗ فَلَمَّا فَعَلُوْا ذٰلِكَ ضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ الى قوله فَاسِقُوْنَ ثُمَّ قَالَ كَلَّا وَاللّٰهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلٰى يَدِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطِرُنَّهٗ عَلَى الْحَقِّ اَطْرًا۔ (رواه ابو داؤد والترمذی كذا فی الترغيب)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا تنزل اس طرح شروع ہوا کہ ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور کسی ناجائز بات کو کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو منع کرتا کہ دیکھ اللہ سے ڈر ایسا نہ کر لیکن اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے کھانے پینے میں اور نشست و برخاست میں ویسا ہی برتاؤ کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تھا جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے قلوب کو بعضوں کے ساتھ خلط کر دیا (یعنی نافرمانوں کے قلوب جیسے تھے ان کی نحوست سے فرماں برداروں کے قلوب بھی ویسے ہی کر دیئے) پھر ان کی تائید میں کلام پاک کی آیتیں لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سے فَاسِقُوْنَ تک پڑھیں اس کے بعد حضور

نے بڑی تاکید سے یہ حکم فرمایا کہ اَمر بِالمعروف اور نہی عَنِ المُنکر کرتے رہو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو، اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو۔

(৩) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম অধঃপতন এইভাবে শুরু হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সহিত সাক্ষাতের সময় কোন অন্যায় কাজ করিতে দেখিলে তাহাকে নিষেধ করিত ও বলিত, দেখ আল্লাহকে ভয় কর এইরূপ করিও না। কিন্তু তাহাদের না মানা সত্ত্বেও উপদেশদাতাগণ পূর্ব সম্পর্কের কারণে তাহাদের সহিত খানাপিনা ও উঠাবসা আগের মতই করিত। যখন ব্যাপকভাবে এইরূপ হইতে লাগিল তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের একের অন্তরকে অন্যের সহিত মিলাইয়া দিলেন অর্থাৎ নাফরমানদের অন্তর যেইরূপ ছিল তাহাদের সহিত সম্পর্কের কারণে নেক লোকদের অন্তরও ঐরূপ করিয়া দেওয়া হইল। তারপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহার সপক্ষে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا হইতে فَاسِقُوْنَ পর্যন্ত। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব জোর দিয়া হুকুম করিলেন যে, তোমরা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিতে থাক। জালেমকে জুলুম হইতে ফিরাইতে থাক। তাহাকে সৎপথে টানিয়া আনিতে থাক। (তারগীব ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী)

আরেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন ; আবেগের সহিত উঠিয়া বসিয়া গেলেন এবং কসম খাইয়া বলিলেন ঃ তোমরা যে পর্যন্ত তাহাদেরকে জুলুম করা হইতে ফিরাইয়া না রাখিবে সেই পর্যন্ত মুক্তি পাইবে না।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসম খাইয়া বলিয়াছেন ঃ তোমরা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিতে থাক, জালেমকে জুলুম হইতে ফিরাইতে থাক এবং সত্যের দিকে টানিয়া আনিতে থাক। না হয় তোমাদের অন্তরকেও ঐরূপ মিলাইয়া দেওয়া হইবে যেইরূপ তাহাদের করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে তোমাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হইবে যেইভাবে অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে বনী ইসরাঈলের উপর।

ইহার সপক্ষে কুরআনের আয়াত এইজন্য তেলাওয়াত করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতে তাহাদের উপর লা'নত করিয়াছেন এবং

উহার অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহারা 'অসৎকাজে একে অপরকে নিষেধ করিত না'।

আজকাল সকলের সাথে তাল মিলাইয়া চলাকে প্রশংসনীয় গুণ বলিয়া মনে করা হয়। পরিবেশের সাথে তাল মিলাইয়া কথা বলাকে উন্নত চরিত্র ও নৈতিক উদারতা বলিয়া অভিহিত করা হয়। অথচ ইহা সম্পূর্ণ ভুল। বরং যে ক্ষেত্রে সৎকাজে আদেশ ইত্যাদি ফলদায়ক হইবে না বলিয়া নিশ্চিতভাবে জানা থাকে সেই ক্ষেত্রে হয়ত চুপ থাকার কিছু অবকাশ থাকিবে কিন্তু হাঁর সাথে হাঁ মিলানোর অবকাশ নাই। আর যে ক্ষেত্রে ফলদায়ক হইতে পারে যথা আপন সন্তান, পরিবার-পরিজন ও অধীনস্থদের ক্ষেত্রে অন্যায় দেখিয়া চুপ থাকাকে কিছুতেই চারিত্রিক উদারতা বলা যায় না ; বরং যে চুপ থাকিবে সে শরীয়ত ও সমাজ উভয় দৃষ্টিতেই অপরাধী।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতিবেশী ও বন্ধু মহলে প্রিয় ও প্রশংসনীয় হয় (বেশী সম্ভাবনা যে,) এইরূপ লোক মুদাহিন হইবে (অর্থাৎ দ্বীনের ব্যাপারে তাল মিলাইয়া চলে)।

বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে, যখন কোন গোনাহের কাজ গোপনে করা হয় উহাতে গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর যদি কোন গোনাহের কাজ প্রকাশ্যে করা হয় এবং লোকেরা উহাকে বন্ধ করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও বন্ধ করে না তবে উহার ক্ষতিও ব্যাপক হয়।

এখন প্রত্যেকে নিজের ব্যাপারেই চিন্তা করিয়া দেখুক কত গোনাহের কাজ তাহার জানা মতে এমন করা হইতেছে যেগুলিকে সে বন্ধ করিতে পারে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অবহেলা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করিতেছে। ইহার চাইতেও বড় জুলুমের কথা এই যে, আল্লাহর কোন বান্দা উহাকে বন্ধ করার চেষ্টা করিলে তাহার বিরোধিতা করা হয়, তাহাকে সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন বলা হয় এবং সাহায্য করার পরিবর্তে তাহার মোকাবেলা করা হয়। فَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ('জালেমগণ অতি শীঘ্রই জানিতে পারিবে তাহাদের গন্তব্যস্থল কোথায়।')

(۴) عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَّجُلٍ يَكُوْنُ فِىْ قَوْمٍ يُّعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِىْ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُّغَيِّرُوْا عَلَيْهِ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت وقوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے

وَلَا يُغَيِّرُوْنَ اِلَّاۤ اَصَابَهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتُوْا (رواه ابوداؤد وابن ماجة وابن حبان والاصبهانى وغيرهم كذا فى الترغيب)

پہلے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔

(৪) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ যদি কোন কওম বা জামাতের মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন গোনাহের কাজে লিপ্ত হয় এবং ঐ কওম বা জামাতের মধ্যে শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহাকে উক্ত গোনাহ হইতে বাধা না দেয়, তবে মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই তাহাদের উপর আল্লাহর আজাব আসিয়া যায়।

(তারগীব ঃ আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, ইস্‌বাহানী)

হে আমার মুখলেস বুযুর্গ এবং ইসলাম ও মুসলমানের উন্নতিকামী বন্ধুগণ! ইহাই হইল মুসলমানদের ধ্বংস ও ক্রমবর্ধমান অবনতির কারণ। প্রত্যেক ব্যক্তি অপরিচিত ও সমপর্যায়ী লোকদেরকে নহে বরং আপন পরিবার–পরিজন, সন্তান–সন্ততি অধীনস্থ ও ছোটদের প্রতি একটু লক্ষ্য করিয়া দেখুন তাহারা কি পরিমাণ প্রকাশ্য গোনাহের মধ্যে লিপ্ত রহিয়াছে; আর আপনারা নিজেদের প্রভাব–প্রতিপত্তি দ্বারা তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিতেছেন কিনা। বাধা দেওয়ার কথা ছাড়িয়া দিন বাধা দেওয়ার এরাদাই বা করেন কিনা। অথবা এই আশঙ্কা আপনার মনে আসে কিনা যে, আমার প্রিয়পুত্র কি করিতেছে। যদি সে সরকারের বিরুদ্ধে কোন অন্যায় কাজ করে বা অপরাধও নহে শুধু সরকার বিরোধী কোন রাজনৈতিক সভা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে, তবে আপনিও উহাতে জড়াইয়া পড়ার ভয়ে চিন্তিত হইয়া যান। তাহাকে শাসন করা হয় এবং নিজে নির্দোষ ও দায়মুক্ত থাকিবার জন্য বিভিন্ন রকম তদবীর করা হয়। কিন্তু আহকামুল হাকেমীন আল্লাহ তায়ালার নাফরমানের সাথেও কি সেই আচরণ করা হয় যাহা এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার নগণ্য সরকারী অপরাধীর সাথে করা হয়।

আপনি ভাল করিয়া জানেন—আপনার প্রিয়পুত্র দাবা খেলায় আসক্ত ও তাসখেলায় ডুবিয়া থাকে, কয়েক ওয়াক্তের নামায ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু আফসোস! কখনও আপনার মুখ হইতে ভুলেও এই কথা বাহির হয় না যে, বেটা! কি করিতেছ? ইহা তো মুসলমানের কাজ নয়। অথচ তাহার সহিত খানাপিনাও ছাড়িয়া দেওয়ার হুকুম ছিল, যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ببیں تفاوتِ رہ از کجاست تا بکجا۔

দেখ উভয় পথের মধ্যে কত দূরত্ব কত পার্থক্য!

এমন অনেক লোক পাওয়া যাইবে, যাহারা ছেলের উপর এইজন্য নারাজ যে, ছেলে অলস ও ঘরে বসিয়া থাকে; চাকরির চেষ্টা করে না অথবা দোকানের কাজে মনোযোগ দেয় না; কিন্তু এমন লোক খুব কমই পাওয়া যাইবে যাহারা ছেলের উপর এই জন্য নারাজ হয় যে, সে জামাতে নামায আদায় করে না কিংবা নামায কাজা করিয়া দেয়।

বুযুর্গ ও বন্ধুগণ! দ্বীনের প্রতি উদাসীনতা যদি শুধু আখেরাতের জন্যই ক্ষতিকর হইত তবুও ইহা হইতে বহু দূরে সরিয়া থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সর্বনাশ তো এই যে, যে দুনিয়াকে আমরা কার্যতঃ আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিয়া থাকি, সেই দুনিয়ার ধ্বংসও দ্বীনের প্রতি এই উদাসীনতার কারণেই হইতেছে। চিন্তা করুন—এই অন্ধত্বের কি কোন সীমা আছে?

مَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖۤ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى

অর্থাৎ, এই দুনিয়াতে যাহারা অন্ধ থাকিবে তাহারা আখেরাতেও অন্ধ থাকিবে। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৭২)

আসল কথা হইল, যেন এই আয়াতের প্রতিচ্ছবি—

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের অন্তর ও তাহাদের কানের উপর সিল–মোহর মারিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের চোখের উপর পর্দা পড়িয়া আছে। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ৭)

(٥) رُوِىَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَزَالُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تَنْفَعُ مَنْ قَالَهَا وَتَرُدُّ عَنْهُمُ الْعَذَابَ وَالنِّقْمَةَ مَا لَمْ يَسْتَخِفُّوْا بِحَقِّهَا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِسْتِخْفَافُ بِحَقِّهَا قَالَ يَظْهَرُ الْعَمَلُ بِمَعَاصِى

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ (کلمۂ توحید) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ) کہنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا کو دفع کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف نہ کیا جائے۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ اس کے حقوق سے

اللهِ فَلَا يُنْكَرُ وَلَا يُغَيَّرُ.
(رواه الاصبهانى ترغيب)

بے پرواہی واستخفاف کیے جانے کا کیا مطلب ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر کی جائیں اور ان کو بند کرنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے.

(৫) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ কালেমায়ে তাওহীদ লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) ইহার পাঠকারীকে সর্বদা উপকার করিতে থাকে এবং তাহার উপর হইতে আজাব ও বালা–মুসীবত দূর করিতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত উহার হক আদায়ের ব্যাপারে বেপরোয়াভাব ও অবহেলা না করা হয়। সাহাবীগণ (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহার হক আদায়ের ব্যাপারে বেপরোয়াভাব ও অবহেলা না করার অর্থ কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন ঃ প্রকাশ্যে আল্লাহর নাফরমানী করা হয় আর উহাকে বন্ধ করার কোন চেষ্টা করা হয় না। (তারগীব ঃ ইস্‌বাহানী)

এখন আপনিই একটু ইনসাফ করিয়া বলুন, বর্তমানে আল্লাহর নাফরমানীর কি কোন সীমারেখা আছে? এবং উহাকে বাধা দেওয়ার অথবা বন্ধ করার কিংবা কিছুটা কমাইয়া আনার কি কোন চেষ্টা চলিতেছে? নিশ্চয়ই না। এইরূপ ভয়াবহ অবস্থায় মুসলমান যে জগতের বুকে টিকিয়া আছে ইহাই আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহমাত্র। নতুবা আমরা আমাদের ধ্বংসের জন্য কোন্ কাজটি করিতে বাকী রাখিয়াছি।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন, দুনিয়াবাসীর উপর যদি আল্লাহর আজাব নাযিল হয় এবং সেখানে কিছু দ্বীনদার লোকও থাকেন, তবে তাহাদেরও কি কোন ক্ষতি হইবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে ফরমাইলেন ঃ দুনিয়াতে তো সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কিন্তু আখেরাতে তাহারা গোনাহগারদের হইতে পৃথক হইয়া যাইবে। অতএব, ঐ সমস্ত লোক যাহারা নিজেদের ধর্ম–কর্মের উপর নিশ্চিন্ত হইয়া লোক সমাজ হইতে দূরে সরিয়া নির্জনে বসিয়া রহিয়াছেন তাহারা যেন ইহা হইতে বে–ফিকির না থাকেন। কেননা, খোদা না করুন, যদি পাপের ব্যাপকতার কারণে কোন আজাব আসিয়া পড়ে তবে তাহাদিগকেও উহার স্বাদ ভোগ করিতে হইবে।

(٦) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت کدہ پر

فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهٖ اَنْ قَدْ حَضَرَهُ شَيْءٌ فَتَوَضَّأَ وَمَا كَلَّمَ اَحَدًا فَلَصِقْتُ بِالْحُجْرَةِ اَسْتَمِعُ مَا يَقُوْلُ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ لَكُمْ مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ اَنْ تَدْعُوْا فَلَا اُجِيْبَ لَكُمْ وَتَسْأَلُوْنِيْ فَلَا اُعْطِيَكُمْ وَتَسْتَنْصِرُوْنِيْ فَلَا اَنْصُرَكُمْ فَمَا زَادَ عَلَيْهِنَّ حَتّٰى نَزَلَ (رواه ابن ماجة وابن حبان فى صحيحه كذا فى الترغيب)

تشریف لائے تو میں نے چہرۂ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے، حضورؐ نے کسی سے کچھ بات چیت نہیں فرمائی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے. میں حجرہ کی دیوار سے لگ کر سننے کھڑی ہو گئی کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. حضورؐ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمد وثنا کے بعد ارشاد فرمایا: لوگو! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے (امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا وہ وقت آجائے کہ تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے، تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں". یہ کلمات طیبات حضورؐ نے ارشاد فرمائے اور منبر سے نیچے تشریف لے آئے.

(৬) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, একদা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে তশরীফ আনিলেন, আমি তাঁহার চেহারা মোবারকের দিকে লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলাম, নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপার দেখা দিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাহারও সাথে কোনরূপ কথাবার্তা না বলিয়া ওযু করিয়া মসজিদে তশরীফ নিয়া গেলেন। আমি তাঁহার কথা শুনিবার জন্য ঘরের দেওয়ালে গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের মিম্বরে তশরীফ রাখিলেন। অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করিয়া এরশাদ ফরমাইলেন ঃ "হে লোকসকল! আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিতে থাক, নতুবা এমন সময় হয়ত আসিয়া পড়িবে যখন তোমরা দোয়া করিবে কিন্তু উহা কবুল করা হইবে না, তোমরা সওয়াল করিবে কিন্তু উহা পূরণ করা হইবে না, তোমরা শত্রুর বিরুদ্ধে আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে কিন্তু আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিব না।" হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পবিত্র কথা কয়টি বলিয়া মিম্বর হইতে নামিয়া আসিলেন।

(তারগীব ঃ ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান)

এই বিষয়টির প্রতি যেন ঐ সকল লোক বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন, যাহারা শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য দ্বীনি বিষয়সমূহে অবহেলা ও শিথিলতার উপর জোর দিয়া থাকেন। কেননা, এই হাদীসেই প্রমাণ রহিয়াছে যে, মুসলমানদের সাহায্য একমাত্র দ্বীনের মজবুতীর উপরই নির্ভর করে।

বিশিষ্ট বুযুর্গ সাহাবী হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, তোমরা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিতে থাক। নচেৎ তোমাদের উপর আল্লাহ তায়ালা এমন জালেম বাদশাহ নিযুক্ত করিয়া দিবেন, যে তোমাদের বড়দের সম্মান করিবে না, তোমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করিবে না। ঐ সময় তোমাদের বুযুর্গ ব্যক্তিগণ দোয়া করিবেন কিন্তু উহা কবুল হইবে না, তোমরা সাহায্য চাহিবে কিন্তু সাহায্য করা হইবে না। তোমরা ক্ষমা চাহিবে কিন্তু ক্ষমা করা হইবে না।

স্বয়ং আল্লাহ পাক এরশাদ করিতেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য কর, তাহা হইলে আল্লাহ পাকও তোমাদের সাহায্য করিবেন এবং শত্রুর মোকাবেলায় তোমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখিবেন। (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ঃ ৭)

অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ

অর্থ ঃ যদি আল্লাহ পাক তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তবে তোমাদের উপর কেহই জয়লাভ করিতে পারিবে না। আর যদি তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করেন, তবে আর কে আছে যে, তোমাদেরকে সাহায্য করিতে পারে? আর মুমিনদের একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা উচিত।

(সূরা আলি ইমরান, আয়াত ঃ ১৬০)

'দুররে মান্‌সূর' কিতাবে তিরমিযী শরীফের সূত্রে হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসম খাইয়া এই কথা বলিয়াছেন যে, তোমরা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিতে থাক, নতুবা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর স্বীয় আজাব নাযিল করিয়া দিবেন। তখন তোমরা দোয়া করিলেও দোয়া কবুল হইবে না।

আমার বুযুর্গ বন্ধুগণ! এখানে পৌঁছিয়া প্রথমে চিন্তা করুন, আমরা

আল্লাহ তায়ালার কি পরিমাণ নাফরমানী করিতেছি তখন বুঝে আসিয়া যাইবে যে, কেন আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে এবং কেনই বা আমাদের দোয়া কবুল হইতেছে না। আমরা কি উন্নতির বীজ বপন করিতেছি, না অবনতির।

(۷) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا عَظَّمَتْ اُمَّتِيَ الدُّنْيَا نُزِعَتْ مِنْهَا هَيْبَةُ الْاِسْلَامِ وَاِذَا تَرَكَتِ الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةَ الْوَحْيِ وَاِذَا تَسَابَّتْ اُمَّتِيْ سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللّٰهِ.

(كذا فى الدر عن الحكيم الترمذى)

نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری اُمت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقعت اس کے قلوب سے نکل جائے گی اور جب اَمر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہٗ کی نگاہ سے گر جائے گی۔

(৭) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যখন আমার উম্মত দুনিয়াকে বড় মনে করিতে আরম্ভ করিবে, তখন ইসলামের মর্যাদা ও গুরুত্ব তাহাদের অন্তর হইতে বাহির হইয়া যাইবে এবং যখন সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ পরিত্যাগ করিবে, তখন ওহীর বরকত হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে। আর যখন একে অপরকে গালি-গালাজ করিতে শুরু করিবে, তখন আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টি হইতে পড়িয়া যাইবে। (দুররে ঃ হাকীম তিরমিযী)

হে জাতির উন্নতিকামী বন্ধুগণ! ইসলাম ও মুসলমানের উন্নতির জন্য তো সকলেই চেষ্টা করিতেছে ; কিন্তু উহার জন্য যে সব পন্থা অবলম্বন করা হইতেছে সেইগুলি অধঃপতনের দিকে লইয়া যাইতেছে। যদি আসলেই আপনারা আপনাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যিকার রাসূল মনে করিয়া থাকেন তাঁহার তালীমকে সত্যিকার তালীম বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তবে কি কারণে যে জিনিসকে তিনি রোগের কারণ বলিতেছেন ; যেইসব জিনিসকে তিনি রোগের মূল বলিতেছেন উহাকেই আপনারা রোগের চিকিৎসা হিসাবে গ্রহণ করিতেছেন?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন,

'কোন ব্যক্তি ঐ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হইতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার খাহেশ ঐ দ্বীনের অধীন না হইবে যাহা আমি লইয়া আসিয়াছি।' কিন্তু আপনাদের অভিমত হইল, ধর্মের বাধাকে মাঝখান হইতে উঠাইয়া দেওয়া হউক, যাহাতে আমরাও অন্যান্য জাতির মত উন্নতি করিতে পারি।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ
الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِیْ حَرْثِهٖ ۚ
وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ
الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ
فِی الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ۝
(پ۲۵-ع۳)

جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم
اُس کی کھیتی میں ترقی دیں گے اور جو
دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو کچھ
دنیا دے دیں گے اور آخرت میں
اُس کا کچھ حصّہ نہیں۔
(بیان القرآن)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল চায় আমি তাহার ফসলে উন্নতি দান করিব। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল চায় আমি তাহাকে দুনিয়া হইতে সামান্য কিছু দিব কিন্তু আখেরাতে তাহার কোন অংশই নাই।

(সূরা শূরা, আয়াত ঃ ২০)(বয়ানুল কুরআন)

হাদীস শরীফে আছে, যে মুসলমান আখেরাতকে নিজের লক্ষ্যবস্তু বানাইয়া লয়, আল্লাহ তায়ালা তাহার অন্তরকে ধনী বানাইয়া দেন এবং দুনিয়া অপদস্থ হইয়া তাহার নিকটে হাজির হয়। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াকে আপন লক্ষ্যবস্তু বানাইয়া লয় সে বিভিন্ন রকমের পেরেশানীতে লিপ্ত হয় আর দুনিয়া হইতে যতটুকু তাহার ভাগ্যে নির্ধারিত হইয়াছে উহার চাইতে অধিক সে পাইতেই পারে না।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিয়া এরশাদ করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার এবাদতের জন্য অবসর হইয়া যাও, আমি তোমার অন্তরকে চিন্তামুক্ত করিয়া দিব এবং তোমার অভাব দূর করিয়া দিব। আর যদি তাহা না কর তবে তোমার অন্তরকে শত শত পেরেশানী দ্বারা ভর্তি করিয়া দিব এবং তোমার অভাবও দূর করিব না।

ইহা তো হইল আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের কথা। আর আপনাদের অভিমত হইল, উন্নতির ক্ষেত্রে মুসলমানরা এইজন্য পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে যে, উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য যে পন্থাই অবলম্বন করা হয় মোল্লারা উহাতে বাধার সৃষ্টি করে। আপনারাই একটু ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখুন—এই মোল্লারা যদি এতই লোভী হইয়া থাকে, তাহা হইলে

আপনাদের উন্নতি তো তাহাদেরই খুশী ও আনন্দের কারণ হইবে। কেননা আপনাদের ধারণা মতে তাহাদের রুজি যখন আপনাদের দ্বারাই আসে, তখন যে পরিমাণ পার্থিব উন্নতি ও সচ্ছলতা আপনাদের হইবে উহা তাহাদেরও উন্নতি ও সচ্ছলতার কারণ হইবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এইসব স্বার্থপর (?) মোল্লাগণ আপনাদের বিরোধিতা করেন। নিশ্চয়ই কোন অপারগতার কারণে বাধ্য হইয়া তাহারা দুনিয়ার লাভকে বিসর্জন দিতেছেন এবং আপনাদের মত দরদী বন্ধুদের হইতে দূরে সরিয়া যেন নিজেদের দুনিয়া নষ্ট করিতেছেন।

বন্ধুগণ! একটু চিন্তা করিয়া দেখুন—যদি এই মোল্লাগণ এইরূপ কোন কথা বলেন, যাহা কুরআন পাকেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, তবে শুধুমাত্র জিদ ও হিংসার বশবর্তী হইয়া উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া নেওয়া সুস্থ জ্ঞানেরই শুধু বিপরীত নয় বরং ইসলামের শানেরও খেলাফ। কারণ, এই মোল্লারা যতই অনুপযুক্ত হউন না কেন ; যখন তাহারা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিষ্কার বাণীসমূহ আপনাদের নিকট পৌঁছাইতেছেন তখন এইগুলির উপর আমল করা আপনাদের উপর ফরজ ; অমান্য করিলে অবশ্য জবাবদেহী করিতে হইবে। চরম পর্যায়ের বোকা মানুষও এই কথা বলিতে পারে না যে, সরকারী আইনের এইজন্য কোন পরোয়া করি না যেহেতু ঘোষণাকারী একজন মেথর ছিল।

আপনাদের জন্য ইহাও বলা উচিত নয় যে, এই মৌলবীরা ধর্মীয় কাজে সীমাবদ্ধ থাকার দাবী করা সত্ত্বেও সর্বদা দুনিয়ার মানুষের নিকট সওয়াল করিয়া থাকেন। কেননা, আমার যতটুকু ধারণা—প্রকৃত আলেম কখনও নিজের জন্য সওয়াল করেন না, বরং যিনি যে পরিমাণ আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকেন, তিনি হাদিয়া গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রেও সেই পরিমাণ অমুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন। হাঁ, কোন দ্বীনি কাজের জন্য সওয়াল করিলে তিনি নিজের জন্য সওয়াল না করার যে সওয়াব পাইতেন তাহা অপেক্ষা ইনশাআল্লাহ বেশী সওয়াবের ভাগী হইবেন।

অনেকেই বলিয়া থাকেন, দ্বীন-ইসলামে বৈরাগ্য বা সংসারত্যাগী হওয়ার কোন শিক্ষা নাই বরং ইহাতে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টিকে সমান পর্যায়ে রাখা হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা কুরআনেই বলিয়াছেন ঃ

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ ঃ হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাদিগকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদিগকে দোযখের শাস্তি

হইতে রক্ষা কর।

উক্ত দাবীর সপক্ষে প্রমাণ হিসাবে এই আয়াতের উপর খুবই জোর দেওয়া হয় ; যেন পুরা কুরআন শরীফে আমলের জন্য শুধুমাত্র এই একটি আয়াতই নাযিল হইয়াছে। অথচ সর্বপ্রথম তো আয়াতটির ব্যাখ্যা অভিজ্ঞ আলেমের নিকট হইতে জানিয়া লওয়া উচিত ছিল। এইজন্যই ওলামায়ে কেরাম বলেন, শুধুমাত্র শাব্দিক তরজমা দেখিয়াই নিজেকে কুরআনের আলেম মনে করা মূর্খতার শামিল।

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) ও তাবেয়ীন হইতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ

হযরত কাতাদাহ (রাযিঃ) বলেন, দুনিয়ার কল্যাণের অর্থ হইল সুস্বাস্থ্য ও প্রয়োজন পরিমাণ রিযিক। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, ইহার অর্থ নেক বিবি। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, ইহার অর্থ এলেম ও এবাদত। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, ইহার অর্থ পবিত্র মাল। হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত অর্থ হইল, নেক সন্তান ও মখলুকের প্রশংসা। হযরত জাফর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত অর্থ হইল, স্বাস্থ্য, যথেষ্ট পরিমাণ রিযিক, আল্লাহর কালামের অর্থ বুঝিতে পারা, শত্রুর উপর জয়লাভ করা এবং নেক লোকের সঙ্গ লাভ করা।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত আয়াত দ্বারা যদি দুনিয়ার সর্বপ্রকার উন্নতি উদ্দেশ্য হয়—যেমন আমারও মন ইহা চায়—তবু লক্ষ্য করার বিষয় হইল এই আয়াতে উহার জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করিতে বলা হইয়াছে ; দুনিয়ার মধ্যে লিপ্ত হইতে বা উহার মধ্যে পরিপূর্ণ মত্ত হইতে বলা হয় নাই। আর আল্লাহর দরবারে চাওয়া—চাই ছেঁড়া জুতা সেলাইয়ের ব্যাপারেই হউক না কেন—ইহা তো সরাসরি দ্বীনেরই অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়তঃ দুনিয়া হাসিল করিতে এবং দুনিয়া কামাই করিতে কে নিষেধ করে? অবশ্যই হাসিল করুন এবং খুব আগ্রহ সহকারে হাসিল করুন ; আমাদের কখনও এই উদ্দেশ্য নয় যে, দুনিয়ার মত উপকারী ও লাভজনক বস্তুকে আপনি ছাড়িয়া দিন। বরং আমাদের উদ্দেশ্য হইল, যতটুকু চেষ্টা-পরিশ্রম দুনিয়ার জন্য করেন উহা হইতে বেশী না হইলেও কমপক্ষে উহার সম পরিমাণ চেষ্টা-সাধনা দ্বীনের জন্য করুন। কেননা, আপনারই কথা অনুসারে উক্ত আয়াতে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়কে সমান পর্যায়ে রাখা হইয়াছে। নতুবা আমার প্রশ্ন হইল যে কুরআনে উক্ত আয়াত রহিয়াছে সেই কুরআনেই এই আয়াতও রহিয়াছে, যাহা এই কিতাবে কিছু পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে। অর্থাৎ—

(১)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ

ইহা ছাড়াও এই বিষয় সম্পর্কিত আরও অন্যান্য আয়াত পেশ করা হইল ঃ

(২)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۝ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ۝ (پ ١٥ ـ ع ٣)

(৩)

ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ۝ (سورة آل عمران ركوع ٢)

(৪)

مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۝ (پ ٤ ـ ع ، آل عمران)

(৫)

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۝ (پ ٥ ـ نساء)

(৬)

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ (سورة انعام ع ٤ پ ٧)

(৭)

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

(৮)

تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ؕ (سورة انفال ع ٩ پ ١٠)

(৯)

اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ۝ (سورة توبه ع ٦ پ ١٠)

—৩

(১০)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ○ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ (سورة هود ع ٢ پ ١٢)

(১১)

وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ پ ١٣

(১২)

فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ (پ ١٤ سوره نحل ع ١٤)

নিম্নে উপরোক্ত আয়াতসমূহের ধারাবাহিক তরজমা দেওয়া হইল ঃ

(১) যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল চায় আমি তাহার ফসল বৃদ্ধি করিয়া দেই আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল চায় আমি তাহাকে উহা হইতে কিছু অংশ দান করি ; আর আখেরাতে তাহার কোন অংশ নাই।

(সূরা শূরা, আয়াত ঃ ২০)

(২) যাহারা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া চায়, আমি দুনিয়াতেই তাহাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা এবং যতখানি ইচ্ছা দিয়া থাকি। অতঃপর তাহার জন্য যে জাহান্নাম তৈরী রাখিয়াছি উহাতে সে পর্যুদস্ত ও অপদস্থ হইয়া প্রবেশ করিবে। আর যাহারা আখেরাত চায় এবং উহার জন্য ঈমান সহকারে যথার্থ চেষ্টাও করে তাহাদের চেষ্টার মর্যাদা রক্ষা করা হইবে।

(সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ১৯)

(৩) উহা দুনিয়াবী জীবনের ভোগ-সামগ্রী মাত্র এবং একমাত্র আল্লাহর নিকটই রহিয়াছে সুন্দর পরিণাম। (সূরা আলি ইমরান, আয়াত ঃ ১৪)

(৪) তোমাদের মধ্যে কেহ দুনিয়া চায় আবার কেহ আখেরাত চায়।

(সূরা আলি ইমরান, আয়াত ঃ ১৫২)

(৫) আপনি বলিয়া দিন, দুনিয়ার চীজ-আসবাব অতি তুচ্ছ। আর যাহারা আল্লাহকে ভয় করে তাহাদের জন্য আখেরাতই উত্তম।

(সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৭৭)

(৬) দুনিয়ার জীবন খেলাধুলা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং

পরহেজগারদের জন্য আখেরাতই উত্তম। (সূরা আনআম, আয়াত ঃ ৩২)

(৭) যাহারা নিজেদের দ্বীনকে খেলা ও তামাশার বস্তু বানাইয়াছে, তাহাদেরকে আপনি ত্যাগ করুন। বস্তুতঃ দুনিয়ার জীবন তাহাদিগকে ধোকায় ফেলিয়া রাখিয়াছে। (সূরা আনআম , আয়াত ঃ ৭০)

(৮) তোমরা দুনিয়ার মাল-মাত্তা চাও আর আল্লাহ তোমাদের জন্য পছন্দ করেন আখেরাত। (সূরা আনফাল, আয়াত ঃ ৬৭)

(৯) তোমরা কি আখেরাতকে বাদ দিয়া দুনিয়ার জীবন লইয়া সন্তুষ্ট আছ? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন একেবারেই তুচ্ছ।

(সূরা তওবা, আয়াত ঃ ৩৮)

(১০) যাহারা দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে আমি এখানেই তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া দেই এবং তাহাদের জন্য কিছুই কম করা হয় না। আখেরাতে তাহাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নাই আর এখানে তাহারা যাহা কিছু আমল করিয়াছে সবকিছুই ধুলিসাৎ হইয়া যাইবে। (সূরা হূদ , আয়াত ঃ ১৫)

(১১) তাহারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ লইয়া আনন্দে মাতিয়াছে ; অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জিন্দেগী অতি তুচ্ছ।(সূরা রা'দ, আয়াতঃ ২৬)

(১২) তাহাদের উপর আল্লাহ অভিশাপ এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে বিরাট আজাব। কেননা, তাহারা আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়াকে পছন্দ করিয়াছে। (সূরা নাহ্ল, আয়াত ঃ ১০৬, ১০৭)

উপরোক্ত আয়াতগুলি ছাড়াও আরও অনেক আয়াত এমন রহিয়াছে যেগুলির মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতকে পরস্পর তুলনা করা হইয়াছে। এখানে সমস্ত আয়াত পেশ করা উদ্দেশ্য নয় এবং প্রয়োজনও নাই। কেবল নমুনাস্বরূপ মাত্র কয়েকটি আয়াত সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিয়া দেওয়া হইল। এ সম্পর্কীয় কুরআনের সমস্ত আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হইল, আখেরাতের মোকাবেলায় যে সমস্ত লোক দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় তাহারা চরম পর্যায়ের ধ্বংসের মধ্যে রহিয়াছে।

যদি দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টিকে আপনি সামলাইতে না পারেন, তবে তো শুধু আখেরাতই প্রাধান্য পাওয়ার উপযুক্ত। দুনিয়ার জীবনে মানুষ পার্থিব প্রয়োজন ও জরুরতের খুবই মুখাপেক্ষী—এই কথা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু শুধু এই কারণে যে, মানুষের পায়খানায় যাওয়া খুবই জরুরী ইহা ছাড়া উপায় নাই ; সেইজন্য দিনভর সেখানে বসিয়া থাকিবে ইহা কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি মানিয়া লইবে না।

আল্লাহ তায়ালার হেকমতের প্রতি গভীর দৃষ্টি করিলে এই কথা বুঝা

যাইবে যে, পবিত্র শরীয়তের প্রত্যেকটি জিনিসের একটা শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে ; আল্লাহ তায়ালা শরীয়তের প্রত্যেকটি বিধানকে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। নামাযের ওয়াক্তসমূহ যেভাবে বন্টন করা হইয়াছে উহাতে এই দিকে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, দিবা-রাত্র চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে অর্ধেক সময় বান্দার হক। যাহাকে সে নিজের আরাম-আয়েশের জন্যও ব্যবহার করিতে পারে কিংবা জীবিকা অর্জনেও খরচ করিতে পারে। আর বাকী অর্ধেক আল্লাহর হক। এমতাবস্থায় আপনার উক্তি অনুযায়ী দ্বীন ও দুনিয়াকে যখন সমান পর্যায়ে রাখা হইয়াছে, তখন দিবা-রাত্রির অর্ধেক সময় দ্বীনের কাজে এবং বাকী অর্ধেক সময় দুনিয়ার কাজে খরচ হওয়া উচিত। নতুবা দুনিয়ার ব্যস্ততায় যদি অর্ধেকের বেশী সময় রুজি রোজগারে কিংবা আরাম-আয়েশে খরচ করা হয়, তবে এই কথা নিশ্চিত বুঝিতে হইবে যে, দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। অতএব, আপনার উক্তি অনুযায়ী ইনসাফের কথা ইহাই হয় যে, রাত্র-দিন চব্বিশ ঘন্টার মধ্য হইতে বার ঘন্টা দ্বীনের জন্য খরচ করা হইবে ; তাহা হইলেই দ্বীন ও দুনিয়া উভয়েরই হক আদায় হইবে এবং এই কথা বলা যাইবে যে, ইসলামে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়েরই তালীম দেওয়া হইয়াছে এবং ইসলামে বৈরাগ্য শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। এইসব বিষয় এখানে উল্লেখ করা উদ্দেশ্য ছিল না ; বরং প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে আসিয়া গিয়াছে। এইজন্য সংক্ষেপে কেবল ইশারা করা হইল মাত্র।

এই পরিচ্ছেদে তবলীগ সম্পর্কীয় কিছু হাদীস উল্লেখ করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। সেইসব হাদীস হইতে মাত্র সাতটি হাদীস উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করিতেছি। কারণ, যাহারা আমল করিতে ইচ্ছুক তাহাদের জন্য সাতটি কেন একটি হাদীসই যথেষ্ট। আর যাহারা মানিবে না তাহাদের জন্য এই আয়াতের মর্ম যথেষ্টের উপর অতিরিক্ত। فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ('শীঘ্রই জালেমরা জানিতে পারিবে তাহাদের গন্তব্যস্থল কোথায়।')

পরিশেষে একটি জরুরী আরজ—বিভিন্ন হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, 'ফেৎনার যুগে যখন কৃপণতা বৃদ্ধি পাইবে, মানুষ নিজ নিজ কুপ্রবৃত্তি ও নফসের অনুসরণ করিবে, দুনিয়াকে দ্বীনের উপর প্রাধান্য দিবে, প্রত্যেকে নিজের অভিমতকেই শুধু পছন্দ করিবে ; অন্য কাহারও কথা মোটেও শুনিবে না—তখন হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যের সংশোধনের চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া নির্জন বাস অবলম্বন করার হুকুম দিয়াছেন।' কিন্তু বুযুর্গ মাশায়েখগণের মতে এখনও সেই সময় আসে নাই। কাজেই যাহা কিছু করিবার এখনই সময় থাকিতে করিয়া লওয়া উচিত।

কারণ আল্লাহ না করুন দেখিতে দেখিতে সেই সময় হয়ত আসিয়া উপস্থিত হইয়া যাইবে আর তখন কোন প্রকার এসলাহ ও সংশোধন সম্ভব হইবে না। সেইসঙ্গে শেষোক্ত এই হাদীসটিতে যে দোষগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে সেইগুলি হইতেও বিশেষভাবে বাঁচিয়া থাকা উচিত। কেননা, এই দোষগুলিই হইল যাবতীয় ফেতনার দরজা। এইগুলির পর শুধু ফেতনাই ফেতনা হইবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে এই দোষগুলিকে ধ্বংসকারী দোষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

হে আল্লাহ! আমাদিগকে সমস্ত জাহেরী ও বাতেনী ফেতনা হইতে হেফাজত করুন, আমীন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে একটি বিশেষ বিষয়ের উপর সতর্ক করা উদ্দেশ্য, আর উহা এই যে, বর্তমান যুগে তবলীগের কাজে যেরূপ অবহেলা করা হইতেছে এবং ব্যাপকভাবে মানুষ এই কাজ হইতে একেবারে গাফেল হইয়া যাইতেছে, অনুরূপভাবে কোন কোন লোকের মধ্যে একটি বিশেষ রোগ এই দেখা দিয়াছে যে, যখনই তাহারা ওয়াজ-নসীহত, লেখা, বক্তৃতা ও তালীম-তবলীগ ইত্যাদি কোন দ্বীনি দায়িত্বের কাজ আরম্ভ করে তখনই তাহারা অন্যের ফিকিরে এমন ব্যস্ত হইয়া যায় যে, নিজের কথা একেবারেই ভুলিয়া যায়। অথচ অপরের সংশোধনের তুলনায় নিজের সংশোধনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। অন্যকে নসীহত করিবে অথচ নিজে গোনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকিবে—এইরূপ করা হইতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন।

মেরাজের রাত্রিতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোক দেখিতে পান, যাহাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হইতেছিল। তিনি তাহাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, ইহারা আপনার উম্মতের ঐ সকল ওয়ায়েজ ও বক্তা, যাহারা অন্যদেরকে নসীহত করিত কিন্তু নিজেরা ঐ নসীহতের উপর আমল করিত না। (মিশকাত শরীফ)

এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, কিছুসংখ্যক জান্নাতী লোক কোন কোন জাহান্নামীকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, তোমরা এইখানে কিভাবে পৌঁছিলে অথচ আমরা তো তোমাদের কথার উপর আমল করিয়াই জান্নাতে পৌঁছিয়াছি। তাহারা বলিবে, আমরা তোমাদিগকে নসীহত করিতাম কিন্তু

নিজেরা আমল করিতাম না।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, বদকার আলেমদের প্রতি জাহান্নামের আজাব অতি দ্রুত অগ্রসর হইবে। মূর্তিপূজকদের আগেই তাহাদিগকে আজাব দেওয়া হইতেছে বলিয়া তাহারা যখন আশ্চর্যবোধ করিবে তখন তাহারা উত্তর পাইবে যে, জানিয়া-শুনিয়া অপরাধ করা আর না জানিয়া অপরাধ করা সমান হইতে পারে না।

মাশায়েখগণ লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজে আমল করে না, তাহার ওয়াজ-নসীহত উপকারী হয় না। এই কারণেই বর্তমান যুগে প্রতিদিন জলসা-জলূস ও ওয়াজ-নসীহত হইতেছে, বিভিন্ন ধরণের প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশ পাইতেছে কিন্তু সবই বেকার ও নিস্ফল সাব্যস্ত হইতেছে। স্বয়ং আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান ঃ

أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ
تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ
الْكِتٰبَ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ٥
(ع-٥)

کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام
کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو حالانکہ
پڑھتے ہو کتاب کیا تم سمجھتے نہیں
(ترجمۂ عاشقی)

অর্থাৎ "তোমরা কি অন্য লোকদিগকে সৎকাজে আদেশ করিতেছ এবং নিজেদেরকে ভুলিয়া যাইতেছ অথচ তোমরা কিতাব পড়িয়া থাক, তোমরা কি বুঝ না?" (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ৪৪)(তরজমায়ে আশেকী)

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান ঃ

مَا تَزَالُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْ اَرْبَعٍ عَنْ عُمُرِهٖ
فِيْمَ اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَ
اَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ
اِكْتَسَبَهٗ وَفِيْمَ اَنْفَقَهٗ وَعَنْ
عِلْمِهٖ مَاذَا عَمِلَ فِيْهِ (ترغيب
عن البيهقي وغيره)

قیامت میں آدمی کے قدم اس وقت
تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے
جب تک چار سوال نہ کر لئے جاویں.
عمر کس مشغلہ میں ختم کی. جوانی کس کام
میں خرچ کی. مال کس طرح کمایا تھا اور
کس کس مصرف میں خرچ کیا تھا. اپنے
علم پر کیا عمل کیا تھا.

"কেয়ামতের দিন চারটি প্রশ্নের জিজ্ঞাসাবাদ না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নিজ জায়গা হইতে আপন কদম বিন্দুমাত্রও হটাইতে পারিবে না—এক. জীবন কোন্ কাজে শেষ করিয়াছ? দুই. যৌবন কি কাজে ব্যয়

করিয়াছ? তিন. ধন-দৌলত কিভাবে উপার্জন করিয়াছিলে এবং কি কি কাজে খরচ করিয়াছিলে? চার. স্বীয় এলেমের উপর কতটুকু আমল করিয়াছিলে?"

হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বড় সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, আমার সবচেয়ে বেশী ভয় হয় এই বিষয়ে যে, না জানি কেয়ামতের দিন আমাকে সকলের সামনে ডাকিয়া এই প্রশ্ন করা হয় যে, যতটুকু এলেম শিখিয়াছিলে উহার উপর কতটুকু আমল করিয়াছ। (তারগীব ঃ বাইহাকী)

স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক সাহাবী জানিতে চাহিয়াছেন যে, সমস্ত মখলুকের মধ্যে নিকৃষ্ট কে? তিনি ফরমাইলেন, খারাপের প্রশ্ন করিও না ভালর কথা জিজ্ঞাসা কর ; নিকৃষ্টতম আলেমগণই হইল নিকৃষ্টতম মখলুক।

এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, এলেম দুই প্রকার—এক প্রকার যাহা শুধু জবান পর্যন্তই সীমিত থাকে ; অন্তরে কোনরূপ আছর করে না, কিয়ামতের দিন এইরূপ এলেম ঐ আলেমের বিরুদ্ধে কঠিন প্রমাণস্বরূপ হইবে। আর দ্বিতীয় প্রকার এলেম যাহা অন্তরে আছর করিয়া থাকে এবং ইহাই উপকারী এলেম।

মোটকথা, জাহেরী এলেমের সাথে সাথে বাতেনী এলেমও হাসিল করিতে হইবে যাহাতে এলেমের গুণে অন্তরও গুণান্বিত হয়। আর যদি এলেম অন্তরে আছর না করে, তবে এই এলেমই কিয়ামতের দিন আলেমের বিরুদ্ধে সাক্ষী ও প্রমাণস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, তুমি এলেম অনুযায়ী কি আমল করিয়াছ?

আরও বহু হাদীসে এই অবস্থার উপর কঠিন হইতে কঠিনতর শাস্তির ভয় দেখানো হইয়াছে। এইজন্য মুবাল্লিগ ভাইদের খেদমতে আমার আরজ—তাঁহারা যেন সর্বপ্রথম নিজেদের জাহেরী ও বাতেনী এসলাহের ফিকির করেন। তাহা না হইলে, খোদা না করুন এই সমস্ত ভয়াবহ শাস্তির আওতায় পড়িয়া যাইতে হইবে। আল্লাহ তায়ালা আপন মেহেরবানীতে এই অধম গোনাহগারকেও জাহেরী ও বাতেনী এসলাহের তওফীক দান করুন ; কারণ, নিজ হইতে অধিক বদ আমলওয়ালা আমি আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। আল্লাহ যদি একমাত্র তাঁহার অপার মেহেরবানীতে আমাকে রক্ষা করেন, তাহা হইলেই আমি রক্ষা পাইব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদেও একটি বিশেষ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মুবাল্লিগ ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য। যাহা নিতান্ত জরুরী। আর তাহা এই যে, অনেক সময় তবলীগের কাজে সামান্যতম অসাবধানতার কারণে লাভের সহিত ক্ষতিও শামিল হইয়া যায়। এইজন্য অতি জরুরী হইল যে, এই ক্ষেত্রে সাবধানতার সবকয়টি দিকের প্রতিই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বহু লোক তবলীগের জোশে আসিয়া অন্য মুসলমানের মর্যাদাহানি করিতেও পরোয়া করে না। অথচ মুসলমানের ইজ্জত একটি বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا مَنْ
سَتَرَ عَلٰى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللّٰهُ
فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِىْ
عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ
عَوْنِ اَخِيْهِ. (رواه مسلم وابوداود وغيرهما ترغيب)

جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے
اللہ جل شانہٗ دنیا اور آخرت میں اس
کی پردہ پوشی فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
بندہ کی مدد فرماتے ہیں جب تک کہ وہ
اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔

“যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করিয়া রাখে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাতে তাহার দোষ গোপন করিয়া রাখেন এবং আল্লাহ তায়ালা ঐ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করেন যে পর্যন্ত সে আপন ভাইয়ের সাহায্য করে।” (তারগীব ঃ মুসলিম, আবু দাউদ)

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا مَنْ
سَتَرَ عَوْرَةَ اَخِيْهِ سَتَرَ اللّٰهُ
عَوْرَتَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ
كَشَفَ عَوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ
كَشَفَ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ حَتّٰى يَفْضَحَهٗ
بِهَا فِىْ بَيْتِهٖ۔ (رواه ابن ماجه ترغيب)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا
ہے اللہ جل شانہٗ قیامت کے دن اس
کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان
کی پردہ دری کرتا ہے اللہ جل شانہٗ اس کی
پردہ دری فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس
کو رسوا کر دیتا ہے۔

“যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ–ত্রুটি ঢাকিয়া রাখে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাহার দোষ–ত্রুটি ঢাকিয়া রাখিবেন। আর যে

ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ–ত্রুটি প্রকাশ করিয়া দেয়, আল্লাহ তায়ালা তাহার দোষ–ত্রুটি প্রকাশ করিয়া দেন, এমনকি ঘরে বসিয়া থাকা অবস্থায় তাহাকে অপদস্থ করিয়া দেন।” (তারগীব ঃ ইবনে মাজাহ)

মোটকথা, বহু হাদীসে এই ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য মুবাল্লিগগণের জরুরী কর্তব্য হইল, মুসলমানদের দোষ–ত্রুটি গোপন করা। ইহা হইতে আরও অধিক জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ হইল মুসলমানদের ইজ্জতের হেফাজত করা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট হইতেছে দেখিয়াও তাহাকে সাহায্য করে না আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এমন সময় সাহায্য করিবেন না যখন সে সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইবে।

অপর এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিকৃষ্টতম সুদ হইল কোন মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট করা।

এমনিভাবে অনেক রেওয়ায়াতে মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট করার উপর কঠিন হইতে কঠিনতর শাস্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য মুবাল্লিগ ভাইগণ অত্যন্ত কঠোরভাবে এই ব্যাপারে সতর্ক থাকিবেন যে, অসৎকাজে নিষেধ করিতে গিয়া যেন নিজের পক্ষ হইতে কাহারও দোষ–ত্রুটি প্রকাশ করা না হয়। যে দোষ–ত্রুটি গোপনে জানা যাইবে গোপনেই যেন তাহা নিষেধ করা হয় আর যাহা প্রকাশ্যে করা হয় উহার নিষেধও প্রকাশ্যে করা চাই ; তবে বাধা দেওয়ার সময় ইজ্জতের হেফাজতের ব্যাপারে যথাসাধ্য ফিকির অবশ্যই রাখিতে হইবে। নতুবা সওয়াবের পরিবর্তে গোনাহের আশঙ্কাই বেশী।

মোটকথা, অসৎকাজে নিষেধ অবশ্যই করিতে হইবে, কেননা এ সম্পর্কে যেসব সতর্কবাণী উল্লেখ করা হইল সেইগুলি অত্যন্ত কঠোর। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিতে গিয়া অন্যের ইজ্জত রক্ষার ব্যাপারে সতর্ক থাকার পন্থা এই যে, প্রকাশ্য অন্যায়ের প্রতিকার যেমন নিঃসংকোচে প্রকাশ্যে করা হইবে, তেমনি খুবই খেয়াল রাখিতে হইবে—যে গোনাহ অন্যায়কারীর পক্ষ হইতে প্রকাশ না পায় উহা নিষেধ করিতে গিয়া নিজের পক্ষ হইতে যেন এমন কোন পন্থা অবলম্বন না করা হয় যাহার দরুন উহা প্রকাশ হইয়া যায়।

তবলীগের আদবের মধ্যে ইহাও একটি আদব যে, নম্রতা অবলম্বন করিবে। খলীফা মামুনুর রশীদকে কোন ব্যক্তি কঠোর ভাষায় নসীহত করিলে তিনি বলিলেন, নম্রভাবে নসীহত করুন। কেননা, আল্লাহ পাক

আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হযরত মূসা ও হযরত হারুন (আঃ)কে আমার চাইতে অধম ফেরাউনের নিকট যখন পাঠাইয়াছিলেন তখন নম্রভাবে নসীহত করিতে বলিয়াছিলেন ঃ

قُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا

অর্থাৎ, তোমরা তাহাকে নম্রভাবে উপদেশ দিবে, হয়ত সে নসীহত কবুল করিয়া নিবে। (সূরা ত্বাহা, আয়াত ঃ ৪৪)

এক যুবক হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, আমাকে জেনার অনুমতি দিয়া দিন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া ভীষণ রাগান্বিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই যুবককে ডাকিয়া আরও কাছে আনিলেন এবং বলিলেন, দেখ তুমি কি ইহা পছন্দ কর যে, কোন ব্যক্তি তোমার মায়ের সহিত জেনা করুক? সে উত্তরে বলিল আমার জীবন আপনার উপর কোরবান হউক, ইহা কখনও হইতে পারে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি ইহা পছন্দ করে না যে, কেহ তাহার মায়ের সহিত জেনা করুক। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বলিলেন, তুমি কি পছন্দ কর যে, কেহ তোমার মেয়ের সহিত জেনা করুক? সে উত্তরে বলিল আমার জান আপনার উপর কোরবান হউক, আমি ইহা কখনও পছন্দ করি না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, ঠিক এইভাবেই অন্য কোন লোকও পছন্দ করে না যে, তাহার মেয়েদের সহিত জেনা করা হউক। এইভাবে বোন, খালা, ফুফুর বিষয়ও উল্লেখ করিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকের বুকের উপর হাত রাখিয়া দোআ করিলেন, ইয়া আল্লাহ! তাহার অন্তরকে পবিত্র করিয়া দিন, গোনাহ মাফ করিয়া দিন এবং লজ্জাস্থানকে গোনাহ হইতে হেফাজত করুন। এই হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর হইতে জেনার চাইতে ঘৃণিত তাহার নিকট আর কিছুই ছিল না।

মোটকথা, কাহাকেও বুঝানোর সময় দোয়া, চেষ্টা, নসীহত ও নম্রতার সহিত এইরূপ চিন্তা করিয়া বুঝাইবে যে, তাহার স্থলে কেহ আমাকে নসীহত করিলে আমি নিজের জন্য কিরূপ ব্যবহার পছন্দ করিতাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদেও মোবাল্লিগগণের খেদমতে একটি জরুরী বিষয় আরজ করিতেছি—তাঁহারা যেন নিজেদের বয়ান ও লেখনীকে পরিপূর্ণ এখলাসের গুণে গুনান্বিত করেন। কেননা, এখলাসের সহিত অল্প আমলও দ্বীনী এবং দুনিয়াবী ফলাফলের দিক দিয়া অনেক বড়। আর এখলাসবিহীন আমল না দুনিয়াতে কোন উপকার পৌছায় না আখেরাতে ইহার বিনিময়ে কোন পুরস্কার পাওয়া যায়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ

حق تعالیٰ شانہٗ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔

(مشکوٰۃ عن مسلم)

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাহ্যিক ছূরত ও সম্পদ দেখেন না; তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন। (মিশকাত ঃ মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমান কি? তিনি উত্তর করিলেন, এখলাস। 'তারগীব' নামক কিতাবের অনেক রেওয়ায়াতে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হইয়াছে।

আরও এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত মুআয (রাযিঃ)কে যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামান দেশের গভর্নর বানাইয়া পাঠাইতেছিলেন, তখন তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু নসীহত করুন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন ঃ "দ্বীনের কাজে এখলাসের এহতেমাম করিবে। কেননা, এখলাসের সহিত সামান্য আমলও যথেষ্ট।"

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা আমলের মধ্যে শুধু ঐ আমলই কবুল করেন যাহা একমাত্র তাঁহার জন্যই করা হয়।

আরেক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا اَشْرَكَ فِيْهِ مَعِيْ غَيْرِيْ تَرَكْتُهٗ وَشِرْكَهٗ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَاَنَا مِنْهُ بَرِيْءٌ فَهُوَ لِلَّذِيْ عَمِلَهٗ

(مشکوٰۃ عن مسلم)

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আমি অংশীদারীর ব্যাপারে সকল শরীকদারের চাইতে অধিক বে–নিয়াজ ও অমুখাপেক্ষী। (অর্থাৎ দুনিয়ার শরীকরা অংশীদারীর মুখাপেক্ষী ও ইহাতে সন্তুষ্ট হয় ; কিন্তু আমি সম্পূর্ণ শরীকবিহীন একক স্রষ্টা ; কাহারও পরোয়া করি না—এবাদতের মধ্যে কাহারো অংশীদারিত্ব পছন্দ করি না।) যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যাহার মধ্যে আমার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করিয়া লয়, আমি উহাকে তাহার শরীকের সোপর্দ করিয়া দেই।" অন্য রেওয়ায়াতে আছে—আমি উহা হইতে মুক্ত হইয়া যাই। (মিশকাত ঃ মুসলিম)

আরেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে এক ঘোষণাকারী উচ্চস্বরে ঘোষণা করিবে ঃ যে ব্যক্তি কোন আমলের মধ্যে অন্য কাহাকেও শরীক করিয়াছে, সে যেন তাহার আমলের সওয়াব ও পুরস্কার তাহারই নিকট হইতে চাহিয়া লয়। আল্লাহ তায়ালা অংশীদারীর ব্যাপারে সকল শরীকদারের চাইতে অধিক বে–নিয়াজ ও অমুখাপেক্ষী।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

مَنْ صَلّٰى يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَ
مَنْ صَامَ يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَ
مَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ۔
(مشکوٰۃ عن احمد)

جو شخص ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے وہ
مشرک ہوجاتا ہے اور جو شخص ریاکاری
سے روزہ رکھتا ہے وہ مشرک ہوجاتا ہے
جو شخص ریاکاری سے صدقہ دیتا ہے وہ
مشرک ہوجاتا ہے۔

"যে ব্যক্তি লোক–দেখানোর জন্য নামায পড়ে সে মুশরিক হইয়া যায়, যে লোক দেখানোর জন্য রোযা রাখে সে মুশরিক হইয়া যায়, যে লোক দেখানোর জন্য দান–খয়রাত করে সে মুশরিক হইয়া যায়।"

(মিশকাত ঃ আহমদ)

মুশরিক হইয়া যাওয়ার অর্থ হইল, যাহাদিগকে দেখানোর উদ্দেশ্যে সে এই সমস্ত আমল করিল, আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে তাহাদিগকে সে শরীক করিল। এমতাবস্থায় এই আমলগুলি আল্লাহ তায়ালার জন্য রহিল না বরং যাহাদিগকে দেখানোর উদ্দেশ্যে করিল তাহাদের জন্য হইয়া গেল।

অন্য এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى عَلَيْهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ فَاُتِيَ بِهٖ

قیامت کے دن جن لوگوں کا اوّل وہلہ
میں فیصلہ سُنایا جاوے گا ان میں سے

فَعَرَّفَهٗ نِعْمَتَهٗ فَعَرَفَهَا فَقَالَ
فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ
حَتّٰى اُسْتُشْهِدْتُّ قَالَ كَذَبْتَ
وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُّقَالَ
جَرِيْئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ
فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِيَ
فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَ
عَلَّمَهٗ وَ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ فَاُتِيَ بِهٖ
فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ
فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ
الْعِلْمَ وَ عَلَّمْتُهٗ وَقَرَاْتُ فِيْكَ
الْقُرْاٰنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ
تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ اِنَّكَ
عَالِمٌ وَ قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ هُوَ
قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ
فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِيَ
فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَاَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ
الْمَالِ كُلِّهٖ فَاُتِيَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ
نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ
فِيْهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ
تُحِبُّ اَنْ يُّنْفَقَ فِيْهَا اِلَّا اَنْفَقْتُ
فِيْهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ
فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ
قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ بِهٖ
عَلٰى وَجْهِهٖ ثُمَّ اُلْقِيَ فِي النَّارِ۔

ایک وہ شہید بھی ہوگا جس کو بُلاکر اوّلاً
اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا اظہار فرمائیں
گے جو اس پر کی گئی تھی وہ اس کو پہچانے
گا اور اقرار کرے گا اس کے بعد سُوال کیا
جاوے گا کہ اس نعمت سے کیا کام لیا۔
وہ کہے گا کہ تیری رضا کے لئے جہاد کیا
حتّٰی کہ شہید ہوگیا ارشاد ہوگا کہ جھوٹ
ہے یہ اس لئے کیا تھا کہ لوگ بہادر
کہیں گے سو کہا جاچکا اور جس غرض
کے لئے جہاد کیا گیا تھا وہ حاصل ہوچکی۔
اس کے بعد اُس کو حکم سُنا دیا جاوے گا
اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنّم میں
پھینک دیا جائے گا۔ دوسرے وہ عالم
بھی ہوگا جس نے علم پڑھا اور پڑھایا اور
قرآن پاک حاصل کیا۔ اس کو بُلاکر اس پر
جو انعامات دنیا میں کئے گئے تھے اُن کا
اظہار کیا جاوے گا اور وہ اقرار کرے گا۔
اس کے بعد اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ
ان نعمتوں میں کیا کیا کام کئے وہ عرض کرے
گا کہ تیری رضا کے لئے علم پڑھا اور لوگوں
کو پڑھایا قرآن پاک تیری رضا کے لئے
حاصل کیا۔ جواب ملے گا جھوٹ بولتا ہے
تو نے علم اس لئے پڑھا تھا کہ لوگ عالم
کہیں، اور قرآن اس لئے حاصل کیا تھا کہ
لوگ قاری کہیں سو کہا جاچکا (اور جو غرض
پڑھنے پڑھانے کی تھی وہ پوری ہوچکی)

اس کے بعد اس کو بھی حکم سُنا دیا جاوے (مشکوٰۃ عن مسلم)
گا اور وہ بھی منہ کے بَل کھینچ کر جہنّم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرے وہ مال دار بھی
ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے وُسعتِ رزق عطا فرمائی اور ہر قسم کا مال مرحمت فرمایا، بُلایا
جائے گا اور اس سے بھی نعمتوں کے اظہار اور ان کے اقرار کے بعد پوچھا جائے گا کہ
ان انعامات میں کیا کارگزاری کی ہے۔ وہ عرض کرے گا، کہ کوئی مَصرفِ خیر ایسا نہیں
جس میں خرچ کرنا تیری رضا کا سبب ہو اور میں نے اس میں خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد
ہوگا کہ جھوٹ ہے۔ سب اس لئے کیا گیا کہ لوگ فیّاض کہیں۔ سو کہا جا چکا۔ اس
کو بھی حکم کے موافق کھینچ کر جہنّم میں پھینک دیا جائے گا۔

"কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে সমস্ত লোকের ফয়সালা শুনানো হইবে, তাহাদের মধ্যে একজন ঐ শহীদও হইবে যাহাকে ডাকিয়া আল্লাহ তায়ালা স্বীয় ঐ সমস্ত নেয়ামত স্মরণ করাইবেন যাহা তাহাকে দান করা হইয়াছিল। নেয়ামতসমূহ দেখিয়া সে চিনিতে পারিবে এবং স্বীকার করিবে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, এই সকল নেয়ামতের দ্বারা তুমি কি করিয়াছ? সে উত্তর করিবে, তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিহাদ করিয়াছি ; এমনকি শহীদ হইয়া গিয়াছি। এরশাদ হইবে—তুমি মিথ্যা বলিয়াছ ; লোকে তোমাকে বীরপুরুষ বলিবে এইজন্যই সবকিছু করিয়াছ। সুতরাং তাহা তো বলা হইয়াছে এবং যে উদ্দেশ্যে জিহাদ করিয়াছিলে উহা হাসিল হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তাহাকে হুকুম শুনাইয়া দেওয়া হইবে এবং অধঃমুখী করিয়া টানিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। দ্বিতীয় ঐ আলেমেও হইবে যে নিজে এলেম শিখিয়াছে, অন্যকে শিখাইয়াছে এবং কুরআন পাক হাছিল করিয়াছে। তাহাকে ডাকিয়া দুনিয়াতে যে-সমস্ত নেয়ামত দেওয়া হইয়াছিল স্মরণ করানো হইবে। সে স্বীকার করিবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে—এইসব নেয়ামত পাইয়া তুমি কি কাজ করিয়াছ? সে আরজ করিবে, তোমাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে নিজে এলেম শিখিয়াছি, অন্যকে শিখাইয়াছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাক হাছিল করিয়াছি। উত্তর হইবে—তুমি মিথ্যা বলিতেছ ; বরং লোকে তোমাকে আলেম বলিবে এইজন্য এলেম শিখিয়াছ এবং লোকে তোমাকে ক্বারী বলিবে এইজন্য কুরআন পড়িয়াছ ; আর তাহা বলা হইয়াছে (অর্থাৎ শিখা ও শিখানোর যাহা উদ্দেশ্য ছিল তাহা পূর্ণ হইয়া

গিয়াছে)। অতঃপর তাহাকেও হুকুম শুনাইয়া দেওয়া হইবে এবং অধঃমুখী করিয়া টানিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। তৃতীয় ঐ ধনী ব্যক্তিও হইবে যাহাকে আল্লাহ তায়ালা রিযিকের প্রশস্ততা প্রদান করিয়াছেন এবং সবরকম ধন-সম্পদ দিয়াছেন। তাহাকে ডাকা হইবে এবং নেয়ামতসমূহ স্মরণ করানো হইবে এবং স্বীকারোক্তির পর জিজ্ঞাসা করা হইবে—এই সমস্ত ধন-সম্পদ পাইয়া তুমি কি আমল করিয়াছ? সে উত্তর করিবে, এমন কোন উত্তম স্থান নাই যেখানে খরচ করিলে আপনার সন্তুষ্টি লাভ হয় আর আমি খরচ করি নাই। এরশাদ হইবে, তুমি মিথ্যা বলিতেছ ; বরং লোকে তোমাকে দানশীল বলিবে এইজন্য তুমি এইসব করিয়াছ। সুতরাং উহা বলা হইয়াছে অতঃপর তাহাকেও হুকুম অনুযায়ী জাহান্নামে টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইবে।" (মিশকাত ঃ মুসলিম)

অতএব, খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত জরুরী যে, মুবাল্লিগগণ নিজেদের সমস্ত আমলের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার রেজামন্দী, দ্বীনের প্রচার এবং হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণকে মূল উদ্দেশ্য হিসাবে সামনে রাখিবেন। ইজ্জত-সম্মান ও সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনকে অন্তরে মোটেও স্থান দিবেন না। যদি কখনও এইরূপ খেয়াল অন্তরে আসিয়া পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ 'লা-হাওলা' ও 'এস্তেগফার' দ্বারা এই অবস্থা দূর করিয়া লইবেন। আল্লাহ তায়ালা আপন মেহেরবানী ও তাঁহার প্রিয় মাহবূবের ও তাঁহার পাক কালামের ওসীলায় অধম গোনাহ্‌গারকে এখলাসের তাওফীক দান করুন এবং পাঠকবৃন্দকেও দান করুন ; আমীন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি সর্বসাধারণ মুসলমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে। বর্তমান যমানায় আলেমগণের প্রতি যে শুধু খারাপ ধারণা বা তাহাদেরকে অবহেলা করা হয় তাহাই নহে ; বরং বিরোধিতা ও হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যও সব রকম ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে অবলম্বন করা হইতেছে। বস্তুতঃ দ্বীনের জন্য এহেন পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ, মারাত্মক ও ক্ষতিকর। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, দুনিয়াতে যে-কোন দলে ভালর মধ্যে মন্দও রহিয়াছে তেমনি আলেমগণের মধ্যেও সত্য-মিথ্যা ও ভাল-মন্দ উভয় প্রকারের সংমিশ্রণ আছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এইখানে দুইটি বিষয় অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে লক্ষ্যণীয়। একটি হইল, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন আলেমকে অসৎ বলিয়া নিশ্চিতরূপে

জানা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা উচিত নহে। যেমন কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَاتَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ۝

অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমার প্রকৃত অবস্থা জানা নাই, সেই বিষয়ে তুমি মন্তব্য করিও না, নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু এবং অন্তর এ সবের ব্যাপারে প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

(সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৩৬)(বয়ানুল কুরআন)

আর শুধু এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যে, কথা বলনেওয়ালা হয়ত অসৎ আলেম হইবে—তাহার কথাকে যাচাই না করিয়া বাদ দিয়া দেওয়া আরও অধিকতর জুলুম।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যাপারে এত বেশী সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন যে, ইহুদীরা তওরাত কিতাবের বিষয়বস্তু আরবীতে নকল করিয়া শুনাইত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা ইহাকে সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলিও না বরং এই কথা বলিয়া দাও যে, আল্লাহ তায়ালা যাহা কিছু নাযিল করিয়াছেন আমরা উহা বিশ্বাস করিয়াছি। অর্থাৎ যাচাই না করিয়া কাফেরের বর্ণনাকেও সত্য বা মিথ্যা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে আমরা এই পর্যায়ে পৌছিয়াছি যে, আমাদের মতের বিপরীতে যদি কেহ কোন কথা বলে, তবে বলনেওয়ালার হক ও সত্য হওয়ার সঠিক প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাহার কথা ও বক্তব্যকে নীচু করার জন্য তাহার ব্যক্তিত্বের উপর হামলা করা হয়।

দ্বিতীয় জরুরী বিষয়টি হইল, খাঁটি–হক্কানী ওলামায়ে কেরামও যেহেতু মানুষ ; তাহারা নিষ্পাপ নহেন—নিষ্পাপ হওয়া তো আম্বিয়ায়ে কেরামেরই বৈশিষ্ট্য, কাজেই তাহাদের ভুল–ত্রুটির জন্য তাহারাই দায়ী থাকিবেন। আর ইহা তো আল্লাহ তায়ালার ব্যাপার—তিনি সাজা দিবেন বা মাফ করিয়া দিবেন ; বরং বেশী সম্ভাবনা ইহাই যে, ইনশাআল্লাহ তাহাদের ত্রুটি–বিচ্যুতি মাফই হইয়া যাইবে। কেননা, কোন দয়ালু মনিবের গোলাম যখন নিজের কাজ–কর্ম ছাড়িয়া মনিবের কাজে মশগুল হইয়া যায় এবং মনে–প্রাণে উহাতেই লাগিয়া থাকে তখন মনিব সাধারণতঃ তাহাকে মাফ করিয়াই থাকে। অথচ মহান আল্লাহ তায়ালার সমতুল্য দয়াবান আর কে হইতে পারে! কিন্তু তিনি যদি তাঁহার ন্যায়বিচারের

খাতিরে শাস্তিও দেন তবে উহা তাহার একান্ত নিজস্ব ব্যাপার ; কিন্তু এইসব কারণে লোকদের মনে আলেমগণের প্রতি খারাপ ধারণা সৃষ্টি করা, ঘৃণা পয়দা করা, তাঁহাদিগকে দূরে সরাইয়া রাখার চেষ্টা করা, মানুষের জন্য বেদ্বীন হইয়া যাওয়ার কারণ হইবে। যাহারা এইরূপ করে তাহাদের জন্য আজাব রহিয়াছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

اِنَّ مِنْ اِجْلَالِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْاٰنِ غَيْرِ الْغَالِىْ فِيْهِ وَلَا الْجَافِىْ عَنْهُ وَاِكْرَامَ ذِى السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ

تینوں اصحاب ذیل کا اعزاز اللہ کا اعزاز ہے، ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا وہ محافظ قرآن جو افراط تفریط سے خالی ہو، تیسرا منصف حاکم۔

(ترغیب عن ابی داؤد)

অর্থাৎ, তিন ধরণের মানুষকে সম্মান করার অর্থ আল্লাহ তায়ালাকেই সম্মান করা—এক, বৃদ্ধ মুসলমান। দ্বিতীয়, কুরআনের ঐ রক্ষক যে কম–বেশী করে না। তৃতীয়, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। (তারগীব ঃ আবু দাউদ)

অন্য হাদীসে এরশাদ হইয়াছে ঃ

لَيْسَ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ لَمْ يُبَجِّلْ كَبِيْرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ عَالِمَنَا۔

وہ شخص جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے، ہمارے علماء کی قدر نہ کرے وہ ہماری اُمت میں سے نہیں ہے۔

(ترغیب عن احمد والحاکم وغیرهما)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দের সম্মান করে না, আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না, আমাদের আলেমদের শ্রদ্ধা করে না, সে আমার উম্মতের মধ্যে নহে। (তারগীব ঃ আহমদ, হাকিম)

আরেক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে ঃ

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلٰثٌ لَايَسْتَخِفُّ بِهِمْ اِلَّا مُنَافِقٌ ذُوالشَّيْبَةِ فِى الْاِسْلَامِ وَذُوالْعِلْمِ وَاِمَامٌ مُقْسِطٌ۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین شخص ایسے ہیں کہ ان کو خفیف سمجھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے (نہ کہ مسلمان، وہ تینوں شخص یہ ہیں) ایک بوڑھا مسلمان دوسرا عالم، تیسرا منصف حاکم۔

(ترغیب عن الطبرانی)

অর্থাৎ, তিন ধরণের মানুষকে একমাত্র মুনাফেক ছাড়া আর কেহই হেয় মনে করিতে পারে না—এক, বৃদ্ধ মুসলমান ; দুই, আলেম ; তিন, ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তা। (তারগীব ঃ তাবারানী)

কোন কোন রেওয়ায়াতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নকল করা হইয়াছে, 'আমার উম্মতের ব্যাপারে তিনটি বিষয়ে আমার সবচাইতে বেশী ভয় হয়—এক, তাহাদের দুনিয়াবী উন্নতি বেশী হইতে থাকিবে, যাহার কারণে তাহাদের মধ্যে পরস্পর হিংসা সৃষ্টি হইবে। দ্বিতীয়, তাহাদের মধ্যে কুরআন শরীফ এত ব্যাপক হইয়া যাইবে যে, প্রত্যেকেই উহার মতলব বুঝিতে চেষ্টা করিবে। অথচ কুরআনের অনেক অর্থ ও মতলব এমনও রহিয়াছে যাহা আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই জানে না। আর যাহারা এলেমে গভীর ও পরদর্শী তাহারাও এইরূপ বলে যে, এই সবকিছু আল্লাহর পক্ষ হইতে নাযিল হইয়াছে, আমরা ইহার উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও একীন রাখি। (বয়ানুল কুরআন) অর্থাৎ গভীর এলেমের অধিকারী পারদর্শী ব্যক্তিরাও কেবল সত্যতা স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হইয়া যান ; অধিক কিছু বলিতে সাহস করেন না। এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ লোকের কিছু বলিবার কী অধিকার থাকিতে পারে ! তৃতীয় বিষয় হইল, ওলামায়ে কেরামের হক নষ্ট করা হইবে ; তাহাদের সহিত বে-পরোয়া আচরণ করা হইবে।' 'তারগীব' নামক কিতাবে এই হাদীসখানা 'তাবারানী'র সূত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। হাদীসের কিতাবসমূহে এই ধরণের বহু রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে।

বর্তমান যুগে ওলামা এবং দ্বীনি এলেম সম্পর্কে যে সমস্ত শব্দ সাধারণতঃ ব্যবহার করা হইয়া থাকে 'ফতওয়ায়ে আলমগীরী' কিতাবে সেইগুলির অধিকাংশকে কুফরী শব্দ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু অজ্ঞতার কারণে মানুষ এইসব হুকুম হইতে একেবারে গাফেল। সুতরাং এই ধরণের শব্দ সাধারণভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে অনেক বেশী সাবধান থাকিতে হইবে। আর যদি মানিয়া লওয়া হয় যে, বর্তমান যুগে হক্কানী আলেম একেবারেই নাই—যাহাদেরকে আলেম বলা হয় তাহারা সকলেই ওলামায়ে ছূ বা অসৎ আলেম, এই কথা বলিয়াও তো আপনারা দায়িত্বমুক্ত হইতে পারেন না। কেননা, অবস্থা যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে সমগ্র দুনিয়াবাসীর উপর এই ফরজ দায়িত্ব আসিয়া যায় যে, হক্কানী আলেমগণের একটি জামাত তৈরী করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে এলেম শিখাইতে হইবে। কেননা, সমাজে আলেমগণের জামাত বর্তমান থাকা ফরজে কেফায়াহ। একটি জামাত এই কাজে নিয়োজিত থাকিলে সকলের

ফরজ দায়িত্ব আদায় হইয়া যাইবে, নতুবা সমগ্র দুনিয়াবাসীই গোনাহ্‌গার হইবে।

সাধারণতঃ একটি অভিযোগ এই করা হইয়া থাকে যে, ওলামাদের মতবিরোধ সর্বসাধারণকে ধ্বংস ও বরবাদ করিয়া দিয়াছে। সম্ভবতঃ কথাটি এক পর্যায়ে সহীহ হইতে পারে ; কিন্তু আসল কথা এই যে, ওলামায়ে কেরামের এই মতবিরোধ আজকের নহে, পঞ্চাশ বা শত বৎসরের নহে ; বরং ইসলামের স্বর্ণযুগ এমনকি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন জুতা মোবারক আলামতস্বরূপ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ)কে দিয়া এই ঘোষণা করিতে পাঠাইলেন ঃ যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলিবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। পথে হযরত ওমর (রাযিঃ)–এর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ)কে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্তাবাহক। কিন্তু তবুও হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁহার বুকের উপর এত জোরে দুই হাতে আঘাত করিলেন যে, বেচারা প্রায় চিৎ হইয়া পিছন দিকে পড়িয়া গেলেন। কিন্তু ইহার পর হযরত ওমর (রাযিঃ)–এর বিরুদ্ধে কোন পোষ্টার প্রচার করা হয় নাই এবং কোন সভা হইয়া ইহার প্রতিবাদে কোন রেজুলেশনও পাস হয় নাই।

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)–এর মধ্যে হাজারো মাসায়েল মতবিরোধপূর্ণ রহিয়াছে। চার ইমামের নিকট সম্ভবতঃ ফেকার শাখাগত এমন কোন মাসআলা নাই যাহাতে কোন মতভেদ হয় নাই। চার রাকাত নামাযের মধ্যে নিয়ত হইতে সালাম ফিরানো পর্যন্ত প্রায় দুই শত মাসায়েলে চার ইমামের মধ্যে মতবিরোধ আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতেই পড়িয়াছে। আরও অধিক না–জানি কত রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু মতবিরোধপূর্ণ এতসব মাসায়েলের মধ্যে মাত্র 'রফে ইয়াদাইন' (অর্থাৎ উভয় হাত উঠানো), জোরে 'আমীন' বলা ইত্যাদি দুই–তিনটি মাসআলা ছাড়া অন্য কোন মাসআলা না শুনা যায়, না সেইগুলির জন্য কোন পোষ্টার ছাপা হয়, না কোন প্রতিবাদ বা বিতর্ক সভা হইতে দেখা যায়। কারণ, সাধারণ মানুষ এইসব মতভেদপূর্ণ মাসায়েল সম্পর্কে মোটেও পরিচিত নহে। বরং ওলামায়ে কেরামের এখতেলাফ রহমতস্বরূপ এবং অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ কোন আলেম যদি প্রমাণ সহকারে কোন ফতওয়া প্রদান করেন এবং এই প্রমাণ অন্য কোন আলেমের দৃষ্টিতে সঠিক না হয়, তবে শরীয়ত মোতাবেক তিনি

ভিন্নমত প্রকাশ করিতে বাধ্য। ভিন্নমত প্রকাশ না করিলে তিনি দ্বীনের ব্যাপারে অবহেলাকারী সাব্যস্ত হইবেন এবং গোনাহগার হইবেন।

আসল কথা এই যে, যাহারা আমল করিতে চায় না তাহারাই এই ধরণের অহেতুক ও বেহুদা অজুহাতকে বাহানা বানাইয়া থাকে। নতুবা ডাক্তারদের মধ্যে সর্বদাই মতভেদ হইতেছে, উকিলদের মধ্যেও মতভেদ হইতেছে ; কিন্তু এই মতভেদের কারণে কেহ ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসা করানো এবং উকিলের মাধ্যমে মামলা–মোকাদ্দমা চালানো বাদ দেয় না। অথচ কী মুসীবত যে, কেবল দ্বীনি ব্যাপারে আলেমগণের এখতেলাফকেই বাহানা বানানো হয়। সত্যিকার অর্থে যাহারা আমল করিতে ইচ্ছুক তাহাদের জরুরী কর্তব্য হইল, যে আলেমকে ভাল মনে হয় ; সুন্নতের অনুসারী মনে হয় তাহার কথা অনুযায়ী আমল করিবে, অন্য কাহারও উপর অনর্থক আক্রমণ ও কটুবাক্য বলা হইতে বিরত থাকিবে। শরীয়তের দলীলসমূহ বুঝার এবং এইগুলির পর্যায়ক্রম ঠিক রাখার ক্ষমতা যাহাদের নাই তাহাদের জন্য ওলামায়ে কেরামের এখতেলাফে দখল দেওয়ার কোন অধিকার নাই।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে, অযোগ্য লোকদের নিকট হইতে এলেমের কথা নকল করা এলেমকে ধ্বংস করারই নামান্তর। কিন্তু যেখানে বদ্‌দ্বীনি এই পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট হুকুমসমূহের সমালোচনা করা প্রত্যেকেই নিজের অধিকার বলিয়া মনে করে, সেখানে বেচারা আলেমগণের আর ধর্তব্য কোথায়? কাজেই দোষারোপ যতই করা হইবে তাহা কমই হইবে। وَ مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ("আর যাহারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘন করে তাহারাই প্রকৃত জালিম।")

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইহা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট ও সম্পূরক। পাঠকবৃন্দের খেদমতে এই পরিচ্ছেদে একটি জরুরী আরজ হইল এই যে, আল্লাহওয়ালাদের সাথে অধিক সম্পর্ক রাখা এবং তাঁহাদের খেদমতে বেশী বেশী হাজির হওয়া দ্বীনের কাজে শক্তি বৃদ্ধি ও খায়ের–বরকতের কারণ হয়।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى مِلَاكِ هٰذَا الْاَمْرِ — کیا تجھے دین کی نہایت تقویت دینے

الَّذِىْ تُصِيْبُ بِهٖ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ اَهْلِ الذِّكْرِ۔ (الحديث (مشكوٰة ص۴۱۹)

والی چیز نہ بتاؤں جس سے تو دین و دُنیا دونوں کی فلاح کو پہنچے وہ اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے والوں کی مجلس ہے اور جب تو تنہا ہوا کرے تو اپنے کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے رطب اللسان رکھا کر۔

আমি কি তোমাকে দ্বীনের কাজে শক্তি বৃদ্ধিকারী জিনিসটি বলিয়া দিব না যাহা দ্বারা তুমি দ্বীন ও দুনিয়ার কামিয়াবী হাসিল করিতে পার? উহা হইল আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণকারীদের মজলিস। আর যখন তুমি একাকী থাক তখন তোমার জিহ্বাকে আল্লাহর যিকির দ্বারা সিক্ত রাখ।

(মিশকাত ঃ পৃষ্ঠা ৪১৯)

তবে এই বিষয় যাচাই করিয়া নেওয়া অত্যন্ত জরুরী যে, প্রকৃত আল্লাহওয়ালা কাহারা? আল্লাহওয়ালাদের পরিচয় হইল, সুন্নতের অনুসরণ। কেননা, আল্লাহ তায়ালা আপন মাহবুব হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উম্মতের হেদায়েতের জন্য নমুনাস্বরূপ পাঠাইয়াছেন এবং পবিত্র কুরআনে এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۔ (پ۳ ع ۱۲)

آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدائے تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کردیں گے اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں (بیان القرآن)

অর্থ ঃ আপনি বলিয়া দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর, তাহা হইলে আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন। আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু।

(সূরা আলি ইমরান, আয়াত ঃ ৩১) (বয়ানুল কুরআন)

সুতরাং যে ব্যক্তি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ অনুসরণকারী হইবে সে–ই প্রকৃত আল্লাহওয়ালা। আর যে ব্যক্তি সুন্নতের অনুসরণ হইতে যত দূরে, সে ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য হইতেও তত দূরে।

মুফাস্‌সিরগণ লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সহিত

মহব্বতের দাবী করে অথচ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের বিরোধিতা করে সে মিথ্যুক। কেননা, এশ্‌ক ও মহব্বতের কানূন ও নিয়ম হইল, যাহার সহিত মহব্বত হয় তাহার ঘর, দরজা, দেওয়াল, উঠান–আঙ্গিনা, বাগান এমনকি তাহার কুকুর ও গাধার সহিতও মহব্বত হয়। (কবি বলিতেছেন—)

أَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلَى — أُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارَ وَذَا الْجِدَارَا
وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي — وَلٰكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَا

অর্থ ঃ আমি যখন লায়লার শহরের উপর দিয়া যাই তখন আমি এই দেওয়াল ঐ দেওয়ালকে চুম্বন করিতে থাকি, বস্তুতঃ শহরের ঘর–বাড়ী আমাকে পাগল করে নাই বরং আমাকে পাগল করিয়াছে ঐ সকল লোকদের মহব্বত যাহারা এই শহরে বাস করে।

অন্য এক কবি বলিতেছেন ঃ

تَعْصِى الْإِلٰهَ وَاَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهٗ — وَهٰذَا الْعَمْرِیْ فِی الْفِعَالِ بَدِيْعٌ
لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَاَطَعْتَهٗ — اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُّحِبُّ مُطِيْعٌ

অর্থ ঃ তুমি আল্লাহর মহব্বতের দাবী করিতেছ অথচ তুমি তাঁহার নাফরমানী করিয়া থাক—ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। যদি তুমি নিজ দাবীতে সত্যবাদী হইতে তবে অবশ্যই তুমি তাঁহাকে মানিয়া চলিতে। কেননা, প্রেমিক সর্বদাই তাহার মাহবুবকে মানিয়া চলে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করিবে কিন্তু যে অস্বীকার করিয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'যে অস্বীকার করিয়াছে' এ কথার অর্থ কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে মানিয়া চলিবে সে জান্নাতে যাইবে আর যে নাফরমানী করিবে সে অস্বীকারকারী।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, তোমাদের মধ্যে কেহ ঐ পর্যন্ত মুসলমান হইতে পারিবে না, যে পর্যন্ত তাহার ইচ্ছা ও খাহেশ আমার আনীত দ্বীনের অধীন না হয়। (মিশকাত)

আশ্চর্যের বিষয় যে, ইসলাম ও মুসলমানের উন্নতি ও কল্যাণ সাধনের দাবীদারগণ নিজেরাই আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য হইতে অবাধ্য—তাহাদের সম্মুখে যদি বলা হয় যে, ইহা সুন্নতের খেলাফ ; হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা–বিরোধী, তবে যেন তাহাদিগকে

বর্শা দ্বারা আঘাত করা হয়। কবি বলেন ঃ

خلافِ پیمبر کسے رہ گزید — کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید

অর্থ ঃ যে কেহ নবীর পথ ছাড়িয়া অন্য পথ গ্রহণ করিবে, সে কখনও গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিবে না। মোটকথা এই যে, যাচাইয়ের পর যদি কাহারও আল্লাহওয়ালা হওয়া সাব্যস্ত হইয়া যায় তবে তাহার সহিত সম্পর্ক বৃদ্ধি করা, তাহার খেদমতে বেশী বেশী হাজির হওয়া, তাহার এলেম দ্বারা উপকৃত হওয়া—ইহা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ এবং দ্বীনেরও তরক্কীর কারণ।

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, তোমরা যখন জান্নাতের বাগানে ভ্রমণ কর, তখন উহা হইতে কিছু আহরণ করিয়া লও। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাতের বাগান কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, এলেমের মজলিস।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ ফরমাইয়াছেন, লোকমান (আঃ) তাঁহার পুত্রকে উপদেশ দিয়াছেন—ওলামায়ে কেরামের খেদমতে বেশী বেশী হাজির হওয়াকে জরুরী মনে কর, উম্মতের তত্ত্বজ্ঞানী লোকদের বাণীসমূহ মনোযোগ সহকারে শুন। কেননা, জ্ঞান ও হেকমতের নূর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মুর্দা দিলগুলিকে এমন জিন্দা করিয়া দেন যেমন মুর্দা জমিনকে মুষলধার বৃষ্টির দ্বারা জিন্দা করিয়া থাকেন। আর উম্মতের তত্ত্বজ্ঞানী তাঁহারাই যাহারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানী ; অন্য কেহ নহে।

আরও এক হাদীসে আছে, জনৈক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের জন্য উত্তম সঙ্গী কে? এরশাদ ফরমাইলেন, যাহাকে দেখিলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, যাহার কথায় এলেমের তরক্কী হয় এবং যাহার আমলের দ্বারা আখেরাতের কথা স্মরণ হয়। 'তারগীব' নামক কিতাবে এই রেওয়ায়াতগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে।

এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালার সর্বোত্তম বান্দা তাঁহারাই যাহাদিগকে দেখিলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।

স্বয়ং আল্লাহ পাক বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ (پ۱۱ ع۴)

اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو (بیان القرآن)

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক। (সূরা তওবা, আয়াত ঃ ১১৯)(বয়ানুল কুরআন)

মুফাস্‌সিরগণ লিখিয়াছেন, 'সত্যবাদীদের' দ্বারা এখানে সূফী মাশায়েখগণকে বুঝানো হইয়াছে। যখন কোন ব্যক্তি তাহাদের খাদেম হইয়া যায় তখন তাহাদের তরবিয়ত ও বুযুর্গীর বদৌলতে সে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌছিয়া যায়। শায়খে আকবার (রহঃ) লিখিয়াছেন, যদি তোমার কাজ–কর্ম অপরের ইচ্ছার অধীন না হয়, তবে তুমি সারাজীবন সাধনা করিয়াও মনের খাহেশাত হইতে ফিরিতে পারিবে না। অতএব, যখনই তুমি এমন ব্যক্তি পাইয়া যাও যাহার প্রতি তোমার অন্তরে ভক্তি–শ্রদ্ধা হয়, তখনই তাহার খেদমতে লাগিয়া যাও। তাহার সম্মুখে তুমি মুর্দার মত হইয়া থাক যাহাতে তিনি তোমার ব্যাপারে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন এবং তোমার ইচ্ছা বলিতে যেন কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। তাহার হুকুম পালনে জলদি কর, তিনি যে জিনিস হইতে নিষেধ করেন উহা হইতে বিরত থাক, তিনি যদি পেশা গ্রহণ করিতে হুকুম করেন তবে গ্রহণ কর কিন্তু ইহা তাহার হুকুমের কারণে গ্রহণ কর ; তোমার পছন্দের কারণে নয়, তিনি বসিতে হুকুম করিলে বসিয়া পড়। অতএব ইহা অত্যন্ত জরুরী যে, কামেল শায়েখ তালাশ করিতে তুমি সচেষ্ট হও। তাহা হইলেই তিনি তোমাকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছাইয়া দিবেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, কোন জামাত যখন কোন মজলিসে বসিয়া আল্লাহর যিকিরে মশগুল হয় তখন ফেরেশতারা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে, আল্লাহর রহমত তাহাদিগকে ঢাকিয়া লয় এবং আল্লাহ তায়ালা নিজের পবিত্র মজলিসে তাহাদের আলোচনা করেন। একজন আশেকের জন্য ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত আর কি হইতে পারে যে, স্বয়ং মাহবুবের মজলিসে তাহার আলোচনা হইবে।

অপর এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, যাহারা এখলাসের সহিত আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করিতে থাকে, তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া একজন আহ্বানকারী ঘোষণা দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে মাফ করিয়া দিয়াছেন এবং তোমাদের গোনাহসমূহ নেকী দ্বারা বদলাইয়া দিয়াছেন।

আরেক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, যে মজলিসে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় না এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়া হয় না, সেই মজলিসের লোকেরা কিয়ামতের দিন আফসোস করিবে।

হযরত দাঊদ (আঃ) এই দোয়া করিতেন, আয় আল্লাহ! তুমি যদি আমাকে তোমার যিকিরকারীদের মজলিস ছাড়িয়া গাফেলদের মজলিসে

যাইতে দেখ, তবে তুমি আমার পা ভাঙ্গিয়া দিও। (কবি বলেন—)

جب اس کی صوت وصورت سے ہے محرومی تو بہتر ہے
مرے کانوں کا کر ہونا اور آنکھیں کور ہو جانی

অর্থাৎ, তাহার মধুর কণ্ঠস্বরই যদি আমার কানে না পৌছিল, তাহার সুন্দর চেহারাই যদি আমার চোখে না পড়িল তবে বধির ও অন্ধ হওয়াই ভাল।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, যে সকল মজলিসে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করা হয় সেইগুলি আসমানবাসীদের নিকট এইরূপ আলোকোজ্জ্বল দেখায় যেরূপ দুনিয়াবাসীদের নিকট আকাশের তারকাগুলি।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) একবার বাজারে যাইয়া লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা এখানে বসিয়া রহিয়াছ অথচ মসজিদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করা হইতেছে। লোকেরা দৌড়াইয়া গিয়া দেখিল কিছুই বন্টন করা হইতেছে না। ফিরিয়া আসিয়া সকলেই বলিল, সেখানে তো কিছুই নাই। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা সেখানে কি হইতেছিল? লোকেরা বলিল, কিছু লোক আল্লাহর যিকিরে মশগুল ছিল আর কিছু লোক তেলাওয়াতে মশগুল ছিল। তিনি বলিলেন, ইহাই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ত্যাজ্য সম্পত্তি।

ইমাম গায্‌যালী (রহঃ) এইরূপ অনেক রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। আর সবচাইতে বড় কথা এই যে, স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি হুকুম করা হইয়াছে ঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ
يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ
عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا
قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ
وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ○ (پ ۱۵ - ع ۱۶)

اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے
ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح وشام اپنے
رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی
کے لئے کرتے ہیں اور دنیوی زندگانی
کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں
ان سے ہٹنے نہ پاویں، اور ایسے شخص
کا کہنا نہ مانیں جس کے قلب کو ہم نے
اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا حال حد سے بڑھ گیا ہے۔

অর্থ ঃ হে নবী! আপনি নিজেকে ঐ সকল লোকের সাথে আবদ্ধ রাখুন যাহারা সকাল–সন্ধ্যা আপন রবের এবাদত শুধু তাহার সন্তুষ্টি লাভের আশায় করে এবং দুনিয়ার জিন্দেগীর জাঁক–জমকের আশায় আপনার নজর যেন তাহাদের উপর হইতে সরিয়া না যায় আর আপনি ঐ লোকের কথা মানিবেন না যাহার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ হইতে গাফেল করিয়া রাখিয়াছি এবং সে নিজের খাহেশের উপর চলে এবং তাহার অবস্থা সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। (সূরা কাহ্‌ফ, আয়াত ঃ ২৮)

বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইজন্য আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করিতেন যে, আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক পয়দা করিয়াছেন যাহাদের মজলিসে বসিবার জন্য স্বয়ং আমাকেও আদেশ করা হইয়াছে। উক্ত আয়াতে অপর একটি দলের কথাও বলা হইয়াছে যে, যাহাদের অন্তর আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল, যাহারা খাহেশাতের উপর চলে, যাহারা সীমা অতিক্রম করে, তাহাদের অনুসরণ যেন না করা হয়। এখন ঐসব ব্যক্তি, যাহারা দ্বীন দুনিয়ার প্রতিটি কথা ও কাজে কাফের ফাসেকদের অনুসরণ করিয়া চলে, মুশরিক–নাসারাদের প্রতিটি কথা ও কাজের উপর জীবন উৎসর্গ করিতেছে তাহাদের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত যে, তাহারা কোন্ পথে অগ্রসর হইতেছে।

ترسم نرسی بکعبہ اے اعرابی ——— کیں رہ کہ تو میروی بترکستان است
مراد ما نصیحت بود وکردیم ——— حوالت با خدا کردیم و رفتیم

"হে বেদুঈন পথিক! আমার ভয় হইতেছে তুমি কাবা শরীফে পৌঁছিতে পারিবে না; যে পথ তুমি ধরিয়াছ উহা কাবার পথ নহে বরং তুর্কিস্থানের পথ।"

"আমার কাজ ছিল তোমাকে নছীহত করা; উহা আমি করিয়া দিলাম। অতঃপর তোমাকে আমি আল্লাহর সোপর্দ করিয়া বিদায় নিলাম।"

وَمَا عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلَاغُ

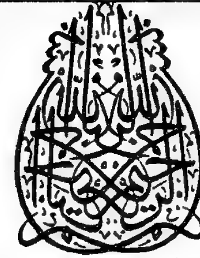
বিনীত নির্দেশ পালনকারী
মুহাম্মদ যাকারিয়্যা কান্ধলবী
মাদরাসা মাজাহিরুল উলূম
৫ই সফর, ১৩৫০, মোতাবিক ঃ ২১শে জুন ১৯৩১
সোমবার রাত্র।

ফাযায়েলে নামায

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

॥॥॥



نَحْمَدُهٗ وَنَشْكُرُهٗ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَاَتْبَاعِهِ الْحُمَاةِ لِلدِّيْنِ الْقَوِيْمِ وَبَعْدُ فَهٰذِهٖ اَرْبَعُوْنَةٌ فِيْ فَضَائِلِ

الصَّلٰوةِ جَمَعْتُهَا اِمْتِثَالاً لِاَمْرِ عَمِّيْ وَصِنْوِ اَبِيْ رَقَاهُ اللّٰهُ اِلَى الْمَرَاتِبِ الْعُلْيَا وَوَفَّقَنِيْ وَاِيَّاهُ

لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضٰى. اَمَّا بَعْدُ

খুতবা ও ভূমিকা

বর্তমান যমানায় দ্বীনের ব্যাপারে যে গাফলতি ও অবহেলা করা হইতেছে, তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনকি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবাদত নামায—যাহার সম্পর্কে সকলেই একমত যে, ঈমানের পর সমস্ত ফরজ এবাদতের মধ্যে ইহাই হইল সবচাইতে অগ্রগণ্য এবং কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ইহারই হিসাব লওয়া হইবে ; এই নামাযের ব্যাপারেও চরম অবহেলা ও উপেক্ষা করা হইতেছে। ইহা হইতে আরও বেশী আফসোসের বিষয় এই যে, দ্বীনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণকারী কোন কথা মানুষের কান পর্যন্ত পৌছিতেছে না এবং দ্বীন পৌছাইয়া দেওয়ার কোন পন্থাই ফলপ্রসূ হইতেছে না। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে এই কথা খেয়ালে আসিয়াছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র এরশাদসমূহ মানুষের নিকট পৌছাইবার চেষ্টা হউক, যদিও ইহাতে যে সমস্ত বাধা-বিপত্তি অন্তরায় স্বরূপ রহিয়াছে, তাহাও আমার মত অল্প জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের অপারগতার জন্য যথেষ্ট। তবুও আশা এই যে, যাহাদের মন-মস্তিষ্ক দ্বীনের বিপরীত কিছু চিন্তা করে না এবং দ্বীনের বিরোধিতা করে না, এই পাক এরশাদসমূহ তাহাদের উপর ইনশাআল্লাহ জরুর আছর করিবে। হাদীসের পবিত্র বাণীসমূহ এবং খোদ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতে তাহাদের ফায়দা ও উপকারের আশা রহিয়াছে। এই পন্থায় কাজ করিলে যে কামিয়াব হওয়া যাইবে—এই বিষয়ে অনেক দোস্ত আহবাব খুব আশাবাদী। ফলে, এই পন্থায় কাজ করিবার জন্য মুখলিছ দোস্তগণের বিশেষ অনুরোধও রহিয়াছে।

এই কিতাবে শুধু নামায সম্পর্কিত কিছু হাদীসের তরজমা পেশ

করিতেছি। ইতিপূর্বে যেহেতু কেবল তবলীগ তথা দ্বীন পৌছানোর হাদীস সম্বলিত 'ফাযায়েলে তবলীগ' নামক অধমের একটি কিতাব প্রকাশিত হইয়াছে, কাজেই তবলীগের সিলসিলায় দ্বিতীয় কিতাব হিসাবে ইহার নাম 'ফাযায়েলে নামায' রাখিতেছি। তওফীক দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, তাঁহারই উপর ভরসা এবং তাঁহারই দিকে রুজু হইতেছি।

নামাযের ব্যাপারে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর লোক দেখা যায় ঃ ১. যাহারা মোটেই নামায পড়ে না। ২. যাহারা নামায পড়ে বটে ; কিন্তু জামাআতের সাথে নামায পড়ার এহ্‌তেমাম করে না। ৩. যাহারা নামায পড়ে এবং জামাআতের সাথেই পড়ে ; কিন্তু বে-পরওয়াভাবে অবহেলার সাথে অসুন্দরভাবে নামায পড়ে।

এই কিতাবে উপরোক্ত তিন শ্রেণীর লোকদের উপযোগী বিষয়বস্তু অনুসারে তিনটি অধ্যায় করা হইয়াছে এবং প্রতিটি অধ্যায়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ তরজমা সহকারে উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে তরজমা সুস্পষ্ট এবং সহজ-সরল হওয়ার দিকে অধিক লক্ষ্য রাখা হইয়াছে ; শাব্দিক তরজমার প্রতি বেশী খেয়াল করা হয় নাই। আর যেহেতু নামাযের প্রতি তবলীগকারী অধিকাংশ আলেমও হইয়া থাকেন এইজন্য হাদীসের হাওয়ালা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আলেমদের জন্য আরবীতে দেওয়া হইল ; সাধারণ লোকদের ইহাতে কোন ফায়দা নাই। অবশ্য যাহারা তবলীগের কাজ করেন, তাহাদের অনেক সময় এইসব হাওয়ালার দরকার হইয়া পড়ে। তরজমা ও ফায়দাসমূহ উর্দূ ভাষায় লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ফাযায়েলে নামায

প্রথম অধ্যায়
নামাযের গুরুত্ব

এই অধ্যায়ে দুইটি পরিচ্ছেদ রহিয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদে নামাযের ফযীলত বর্ণনা করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নামায ছাড়িয়া দেওয়ার কারণে হাদীস শরীফে যে সমস্ত ধমক ও শাস্তির কথা আসিয়াছে তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ
নামাযের ফযীলত

(۱) عَنِ ابْنِ عُمَرَؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ۔ (متفق عليه)
وقال المنذری فی الترغیب رواه البخاری ومسلم وغیرهما عن غیرواحد من الصحابة۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے سب سے اوّل لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ کی گواہی دینا یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اسکے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔

(১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি খুঁটির উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বপ্রথম কালেমায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর সাক্ষ্য দেওয়া অর্থাৎ এই কথা স্বীকার করা যে, আল্লাহ ব্যতীত এবাদতের উপযুক্ত (মাবুদ) আর কেহ নাই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। অতঃপর নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ করা, রমযান মাসের রোযা রাখা। (বুখারী, মুসলিম)

এই পাঁচটি জিনিস ঈমানের প্রধান ভিত্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ আরকান।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীস শরীফে ইসলামকে একটি তাঁবুর সহিত তুলনা করিয়াছেন। যাহা পাঁচটি খুঁটির উপর কায়েম হইয়া থাকে। কালেমায়ে শাহাদাত তাঁবুর মধ্যবর্তী খুঁটির মত। অপর চারিটি আরকান চারি কোণের চারিটি খুঁটির মত। যদি মধ্যবর্তী খুঁটি না থাকে তবে তাঁবু দাঁড়াইতেই পারিবে না। আর যদি মধ্যবর্তী খুঁটি ঠিক থাকে এবং চারি কোণের যে কোন একটি খুঁটি না থাকে, তবে তাঁবু দণ্ডায়মান থাকিবে সত্য কিন্তু যে কোণের খুঁটি না থাকিবে, সেই কোণ দুর্বল হইবে এবং পড়িয়া যাইবে।

এই পবিত্র এরশাদ শোনার পর নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, ইসলামের এই তাঁবুকে আমরা কতটুকু কায়েম রাখিয়াছি এবং ইসলামের এমন কোন রোকন রহিয়াছে যাহাকে আমরা পুরাপুরিভাবে ধরিয়া রাখিয়াছি। ইসলামের এই পাঁচটি রোকন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এমনকি এইগুলিকেই ইসলামের বুনিয়াদ ও ভিত্তি বলা হইয়াছে। মুসলমান হিসাবে প্রত্যেকেরই এই সবগুলি বিষয়ের এহতেমাম করা একান্ত জরুরী। তবে ঈমানের পর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল নামায।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচাইতে বেশী প্রিয় আমল কোন্‌টি? তিনি এরশাদ করিলেন, নামায। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, অতঃপর কোন্ আমল? তিনি বলিলেন, পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, অতঃপর কোন্ আমল? তিনি বলিলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, উক্ত হাদীসে ওলামাদের এই কথার দলীল রহিয়াছে যে, ঈমানের পর নামাযের স্থানই হইল সর্বাগ্রে। ইহার সমর্থন ঐ সহীহ হাদীস দ্বারাও হয় যাহাতে এরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلصَّلٰوةُ خَيْرُ مَوْضُوْعٍ অর্থাৎ নামাযই হইল সর্বোত্তম আমল, যাহা আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের জন্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। ইহা ছাড়া আরও অন্যান্য হাদীসেও অধিক পরিমাণে এবং বিস্তারিতভাবে এই কথা বলা হইয়াছে যে, তোমাদের আমলসমূহের মধ্যে নামাযই হইল সর্বোত্তম আমল। যেমন জামে সগীর কিতাবে হযরত ছাওবান, হযরত ইবনে ওমর, হযরত সালামাহ, হযরত আবূ উমামাহ, হযরত উবাদাহ (রাযিঃ) এই পাঁচজন সাহাবী হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করা হইয়াছে। হযরত ইবনে মাসঊদ ও হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে 'সময় মত নামায পড়াকে

সর্বোত্তম আমল' বর্ণনা করা হইয়াছে। হযরত ইবনে ওমর ও উম্মে ফরওয়া (রাযিঃ) হইতে 'আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়াকে সর্বোত্তম আমল' বর্ণনা করা হইয়াছে। (জামে সগীর) বস্তুতঃ সব হাদীসের উদ্দেশ্য ও মূল লক্ষ্য প্রায় একই।

(٢) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِى الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَاَخَذَ بِغُصْنٍ مِّنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذٰلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلٰوةَ يُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ فَتَهَافَتَ عَنْهُ ذُنُوْبُهٗ كَمَا تَهَافَتَ هٰذَا الْوَرَقُ عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ (رواه احمد باسناد حسن كذا فى الترغيب)

حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے آپ نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی اس کے پتے اور بھی گرنے لگے آپ نے فرمایا اے ابوذر مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لئے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اسکے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں

(২) হযরত আবূ যর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার শীতকালে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিরে তশরীফ আনিলেন, তখন গাছ হইতে পাতা ঝরিয়া পড়িতেছিল। তিনি গাছের একটি ডাল ধরিলেন, ফলে উহার পাতা আরও বেশী করিয়া ঝরিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, হে আবূ যর! মুসলমান বান্দা যখন এখলাসের সাথে আল্লাহর জন্য নামায পড়ে তখন তাহার গোনাহসমূহ এমনভাবে ঝরিয়া যায় যেমন এই গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িতেছে।

(তারগীব ঃ আহমদ)

ফায়দা ঃ শীত মৌসুমে গাছের পাতা এত বেশী ঝরিয়া পড়ে যে, কোন কোন গাছে একটি পাতাও থাকে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র এরশাদ হইল, এখলাসের সহিত নামায পড়ার ফলও এইরূপ যে, নামায আদায়কারীর সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যায় ; একটিও বাকী থাকে না।

তবে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন হাদীসের

কারণে ওলামায়ে কেরামের অভিমত এই যে, নামায ইত্যাদি এবাদতসমূহের দ্বারা শুধু সগীরা গোনাহ মাফ হইয়া থাকে ; কবীরা গোনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না। এইজন্য নামায আদায়ের সাথে সাথে মনোযোগ সহকারে তওবা ও এস্তেগফারও করা চাই—ইহা হইতে গাফেল হওয়া উচিত নয়। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যদি আপন দয়া ও অনুগ্রহে কাহারও কবীরা গোনাও মাফ করিয়া দেন, তবে উহা ভিন্ন কথা।

(৩) عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ كُنْتُ
مَعَ سَلْمَانَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَاَخَذَ
غُصْنًا مِّنْهَا يَابِسًا فَهَزَّهُ حَتّٰى
تَحَاتَّ وَرَقُهُ ثُمَّ قَالَ يَا اَبَا عُثْمَانَ
اَلَا تَسْئَلُنِىْ لِمَ اَفْعَلُ هٰذَا قُلْتُ
وَلِمَ تَفْعَلُهُ قَالَ هٰكَذَا فَعَلَ
بِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ وَاَنَا مَعَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
وَاَخَذَ مِنْهَا غُصْنًا يَابِسًا فَهَزَّهُ
حَتّٰى تَحَاتَّ وَرَقُهُ فَقَالَ يَا سَلْمَانُ
اَلَا تَسْئَلُنِىْ لِمَ اَفْعَلُ هٰذَا قُلْتُ
وَلِمَ تَفْعَلُهُ قَالَ اِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا
تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ صَلَّى
الصَّلَوٰتِ الْخَمْسَ تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ
كَمَا تَحَاتَّ هٰذَا الْوَرَقُ وَقَالَ
اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا
مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ
السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى
لِلذّٰكِرِيْنَ ۚ
(رواه احمد والنسائى والطبرانى
ورواة احمد محتج بهم فى
الصحيح الا على بن زيد كذا

ابو عثمانؓ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی
اللہ عنہ کیساتھ ایک درخت کے نیچے تھا
اُنہوں نے اس درخت کی ایک خشک
ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی جس سے اُس
کے پتے گر گئے پھر مجھ سے کہنے لگے کہ
ابو عثمان تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے یہ کیوں
کیا. میں نے کہا بتا دیجئے کیوں کیا اُنہوں
نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے
تھا آپؐ نے بھی درخت کی ایک خشک
ٹہنی پکڑ کر اسی طرح کیا تھا جس سے اس
ٹہنی کے پتے جھڑ گئے تھے پھر حضورؐ نے
ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان پوچھتے نہیں
کہ میں نے اس طرح کیوں کیا میں نے
عرض کیا کہ بتا دیجئے کیوں کیا. آپؐ نے
ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمان اچھی طرح
سے وضو کرتا ہے پھر پانچوں نمازیں پڑھتا
ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسی ہی
گر جاتی ہیں جیسے یہ پتے گرتے ہیں پھر آپؐ
نے قرآن کی آیت اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ
تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قائم کر
نماز کو دن کے دونوں سروں میں اور

فى الترغيب)

رات کے کچھ حصوں میں بیشک نیکیاں
دور کردیتی ہیں گناہوں کو یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لئے.

(৩) আবূ উসমান (রহঃ) বলেন, আমি হযরত সালমান (রাযিঃ)এর সাথে একটি গাছের নীচে ছিলাম। তিনি ঐ গাছের একটি শুকনা ডাল ধরিয়া নাড়া দিলেন। ফলে উহার পাতা ঝরিয়া পড়িল। তিনি আমাকে বলিলেন, হে আবূ উসমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে না, কেন আমি এইরূপ করিলাম? আমি বলিলাম, বলুন, কেন আপনি এইরূপ করিলেন? তিনি বলিলেন, আমি একবার নবী করীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে একটি গাছের নীচে ছিলাম, তিনিও গাছের একটি শুকনা ডাল ধরিয়া এমনভাবে নাড়া দিলেন যে, উহার পাতাগুলি ঝরিয়া পড়িল। তারপর তিনি আমাকে বলিলেন, হে সালমান! তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ না, কেন আমি এইরূপ করিলাম? আমি বলিলাম, বলুন, কেন আপনি এইরূপ করিলেন? তিনি এরশাদ করিলেন, যখন কোন মুসলমান ভালভাবে ওযূ করিয়া পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে তখন তাহার গোনাহসমূহ এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে, যেমন এই সকল পাতা ঝরিয়া যায়। অতঃপর তিনি কুরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ
السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۚ

অর্থাৎ দিনের উভয় অংশে এবং রাতের একাংশে নামায কায়েম কর। নিশ্চয়ই নেক আমলসমূহ গোনাহসমূহকে দূর করিয়া দেয়। ইহা নছীহত কবূলকারীদের জন্য নছীহত।

(সূরা হুদ, আয়াত ঃ ১১৪) (নাসাঈ, আহমদ, তাবরানী)

ফায়দা ঃ হযরত সালমান (রাযিঃ) যে আমল করিয়া দেখাইলেন, উহা সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইশ্‌ক ও মহব্বতের সামান্যতম নমুনা মাত্র। যখন কাহারও সহিত মহব্বত হয়, তখন তাহার প্রতিটি আচরণ ভাল লাগে এবং প্রতিটি কাজ ঐভাবে করিতে ইচ্ছা হয় যেভাবে প্রিয় ব্যক্তিকে করিতে দেখে। যাহারা ইশ্‌ক ও মহব্বতের স্বাদ পাইয়াছেন তাহারা ইহার আসল রহস্য ভালভাবে জানেন। তদ্রূপ সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র এরশাদসমূহ বর্ণনাকালে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত আচরণসমূহও নকল করিতেন যাহা হুযূর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করার সময় করিয়াছিলেন। মনোযোগ সহকারে নামায আদায় করা এবং উহা দ্বারা গোনাহ মাফ হওয়ার বিষয়টি এত বেশী হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। ইতিপূর্বেও বিভিন্ন হাদীসে এই বিষয়টি বর্ণনা করা হইয়াছে। ওলামায়ে কেরাম এই বিষয়টিকে সগীরা গোনাহের সাথে সম্পর্কিত করিয়াছেন, যেমন ইতিপূর্বে জানা গিয়াছে। কিন্তু হাদীস শরীফে সগীরা কিংবা কবীরার কোন উল্লেখ নাই ; শুধু গোনাহের কথা উল্লেখ আছে। আমার পিতা (হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া (রহঃ) তালীমের সময় এই বিষয়টির দুইটি ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। প্রথম ব্যাখ্যা এই যে, ইহা মুসলমানের শান হইতে অনেক দূরের বিষয় যে, তাহার জিম্মায় কোন কবীরা গোনাহ থাকিবে। প্রথমতঃ তাহার দ্বারা কোন কবীরা গোনাহ হওয়াই অসম্ভব ; আর যদি হইয়াও যায়, তবে তওবা না করিয়া সে শান্তি পাইবে না। মুসলমানের মুসলমানি শান তো ইহাই যে, যদি তাহার দ্বারা কোন কবীরা গোনাহ হইয়া যায় তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে অনুতপ্ত হইয়া চোখের পানি দ্বারা উহাকে ধৌত করিয়া না লইবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার মনে শান্তি ও স্থিরতা আসিতে পারে না। অবশ্য সগীরা গোনাহ এইরূপ যে, অনেক সময় উহার প্রতি খেয়াল যায় না। ফলে জিম্মায় থাকিয়া যায়। যাহা নামায ইত্যাদির বরকতে মাফ হইয়া যায়।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, যে ব্যক্তি এখলাসের সহিত নামায পড়িবে এবং নামাযের আদব ও মুস্তাহাবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নামায আদায় করিবে, সে নিজেই না জানি কতবার তওবা ও এস্তেগফার করিবে। ইহা ছাড়া নামাযের মধ্যে আত্তাহিয়্যাতুর শেষে 'আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফ্‌সী'-র মধ্যে তো খোদ তওবা ও ইস্তেগফার রহিয়াছেই।

এই সমস্ত রেওয়ায়াতে উত্তমরূপে ওযূ করার জন্যও হুকুম করা হইয়াছে। যাহার অর্থ এই যে, ওযূর আদব ও মুস্তাহাবসমূহকে ভালভাবে জানিয়া যত্নসহকারে আমল করা।

উদাহরণ স্বরূপ—যেমন ওযূর একটি সুন্নত হইল মিসওয়াক, যাহার প্রতি সাধারণতঃ গাফলতি করা হয়। অথচ হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, যে নামায মিসওয়াক করিয়া পড়া হয়, উহা ঐ নামায হইতে সত্তর গুণ উত্তম যাহা বিনা মিসওয়াকে পড়া হয়। এক হাদীসে আছে, তোমরা মিসওয়াকের এহতেমাম করিতে থাক ; ইহাতে দশটি উপকার আছে ঃ ১. মুখ পরিস্কার করে ২. আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির কারণ হয় ৩. শয়তানকে রাগান্বিত করে ৪. মিসওয়াককারীকে আল্লাহ তায়ালা মহব্বত করেন এবং

ফেরেশতাগণও মহব্বত করেন ৫. দাঁতের মাড়ী মজবূত করে ৬. কফ দূর করে ৭. মুখে সুগন্ধি আনয়ন করে ৮. পিত্তরোগ দূর করে ৯. দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে ১০. মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

সর্বোপরি মিসওয়াক করা সুন্নত। ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, মিসওয়াকের এহ্‌তেমাম করার মধ্যে সত্তরটি উপকার রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, মৃত্যুর সময় কালেমায়ে শাহাদত নসীব হয়। কিন্তু মিসওয়াকের বিপরীতে আফিম সেবনে সত্তর প্রকারের ক্ষতি রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, মৃত্যুর সময় কালেমা স্মরণ হয় না। উত্তমরূপে ওযূ করার ফযীলতসমূহ বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। কেয়ামতের দিন ওযূর অঙ্গসমূহ উজ্জ্বল ও চমকদার হইবে এবং ইহার দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে আপন উম্মতকে চিনিতে পারিবেন।

(۱۴) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ اَرَاَیْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ یَغْتَسِلُ فِیْهِ كُلَّ یَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ یَبْقٰی مِنْ دَرَنِهٖ شَیْءٌ قَالُوْا لَا یَبْقٰی مِنْ دَرَنِهٖ شَیْءٌ قَالَ فَكَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوٰتِ الْخَمْسِ یَمْحُوا اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَایَا (رواه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی ورواه ابن ماجه من حدیث عثمان كذا فی الترغیب)

حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازہ پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ پانچ مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا صحابہؓ نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا حضورؐ نے فرمایا کہ یہی حال پانچوں نمازوں کا ہے کہ اللہ جل شانہٗ ان کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں۔

(৪/১) হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার এরশাদ ফরমাইয়াছেন, বল দেখি, যদি কোন ব্যক্তির দরজার সম্মুখে একটি নহর প্রবাহিত থাকে, যাহাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তবে তাহার শরীরে কি কোন ময়লা বাকী থাকিবে? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, কিছুই বাকী থাকিবে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অবস্থাও এইরূপ যে, আল্লাহ জাল্লা শানুহূ উহার বদৌলতে গোনাহসমূহ মিটাইয়া দেন। (তারগীব ঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

(৪) عَنْ جَابِرٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الصَّلٰوتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلٰى بَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ۔ (رواه مسلم كذا فى الترغيب)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ پانچوں نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور بہت گہرا ہو۔ اس میں روزانہ پانچ دفعہ غسل کرے۔

(৪/২) হযরত জাবের (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ এইরূপ যেমন, কাহারও দরজার সম্মুখে একটি নহর আছে, যাহার পানি প্রবহমান এবং খুব গভীর, উহাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে।

(তারগীব ঃ মুসলিম)

ফায়দা ঃ প্রবাহিত পানি নাপাকী ইত্যাদি হইতে পাক হয় এবং পানি যত বেশী গভীর হইবে ততই পরিস্কার ও স্বচ্ছ হইবে। এই জন্যই হাদীস শরীফে উহার প্রবাহিত হওয়া এবং গভীর হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। আর যত বেশী পরিস্কার পানি দ্বারা গোসল করিবে তত বেশী শরীর পরিস্কার হইবে। এমনিভাবে আদবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নামাযসমূহ আদায় করা হইলে গোনাহ হইতে পবিত্রতা হাসিল হয়। বিভিন্ন সাহাবী হইতে আরো কতিপয় হাদীসে এই একই ধরণের বিষয় বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায উহার মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফফারা স্বরূপ। অর্থাৎ এক নামায হইতে অপর নামায পর্যন্ত যে সমস্ত সগীরা গোনাহ হয়, তাহা নামাযের বরকতে মাফ হইয়া যায়। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যেমন কোন এক ব্যক্তির একটি কারখানা আছে, যেখানে সে কাজ করে, ফলে তাহার শরীরে কিছু ধূলিবালি ও ময়লা লাগিয়া যায়। ঐ ব্যক্তির বাড়ী ও কারখানার মাঝখানে পাঁচটি নহর রহিয়াছে। যখন সে কারখানা হইতে ঘরে ফিরে, তখন প্রতিটি নহরে সে গোসল করে। অনুরূপভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অবস্থাও এই যে, যখনই মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়া যায়, তখন নামাযের মধ্যে দোয়া-এস্তেগফার করার কারণে আল্লাহ জাল্লা শানুহু উহা পুরাপুরি মাফ করিয়া দেন।

এই ধরণের উদাহরণ দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য এই কথা বুঝাইয়া দেওয়া যে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু গোনাহ-মাফীর ব্যাপারে নামাযকে অনেক শক্তিশালী প্রভাব দান করিয়াছেন। যেহেতু উদাহরণ দ্বারা কোন কথা একটু ভালভাবে বুঝে আসে, এই জন্য বিভিন্ন উদাহরণ দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসের মর্মকে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর এই রহমত, অসীম ক্ষমা, দয়া, পুরস্কার এবং অনুগ্রহ হইতে যদি আমরা উপকৃত না হই, তবে কাহার কি ক্ষতি হইবে? ক্ষতি আমাদেরই হইবে। আমরা গোনাহ করি, না-ফরমানী করি, আল্লাহর হুকুমের সীমা লংঘন করি, আদেশ পালনে ত্রুটি করি, যাহার পরিণতি এই হওয়া উচিত ছিল যে, অনন্ত শক্তিমান ন্যায়বিচারক বাদশাহর দরবারে অবশ্যই আমাদের শাস্তি হইত এবং কৃতকর্মের কারণে ভোগান্তি হইত। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার দয়া ও মেহেরবানীর উপর কুরবান হই যে, তিনি আমাদিগকে তাহার না-ফরমানী ও অবাধ্যতার ক্ষতিপূরণ করিয়া নেওয়ার পথও বলিয়া দিয়াছেন। যদি আমরা ইহা হইতে উপকৃত না হই তবে তাহা আমাদেরই বোকামী। আল্লাহ তায়ালার দয়া ও মেহেরবানী তো দেওয়ার জন্য বাহানা তালাশ করে।

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, যে ব্যক্তি শুইবার সময় এই এরাদা করে যে, আমি তাহাজ্জুদ পড়িব কিন্তু রাত্রে চোখ খুলিল না, তবুও সে উহার সওয়াব পাইবে এবং নিদ্রা সে মুফতে পাইয়া গেল। (তারগীব) আল্লাহ পাকের এই মেহেরবানী ও দয়ার কি কোন পরিসীমা আছে? আর যে দাতা এইভাবে দান করিয়া থাকেন তাহার দান না লওয়া কত বড় মাহরূমী এবং কত বড় ক্ষতি !

(৫) عَنْ حُذَيْفَةَؓ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَزَبَهٗ اَمْرٌ فَزِعَ اِلَى الصَّلٰوةِ۔ (اخرجه احمد وابوداؤد وابن جرير كذا فى الدر المنثور)

حضرت حذیفہؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔

(৫) হযরত হুযাইফাহ (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতেন, তৎক্ষণাৎ তিনি নামাযে মনোনিবেশ করিতেন। (দুররে মানসূর ঃ আবূ দাউদ, আহমদ)

ফায়দা ঃ নামায আল্লাহ তায়ালার বড় রহমত, এইজন্য প্রত্যেক পেরেশানীর সময় নামাযে মনোনিবেশ করা যেন আল্লাহর রহমতের দিকেই ঝুকিয়া পড়া। আর আল্লাহর রহমত যখন কাহারও অনুকূল ও সাহায্যকারী হয়, তখন সাধ্য কি যে, কোন পেরেশানী বাকী থাকিবে? অনেক রেওয়ায়াতে বিভিন্নভাবে এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) যাহারা প্রতিটি কদমে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী ছিলেন, তাঁহাদের ঘটনাবলীতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) বলেন, যখন ধূলিঝড় শুরু হইত, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে তাশরীফ নিয়া যাইতেন এবং ঝড় শেষ না হওয়া পর্যন্ত মসজিদ হইতে বাহির হইতেন না। এমনিভাবে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময়ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে মনোনিবেশ করিতেন। হযরত সুহাইব (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামেরও এই অভ্যাস ছিল যে, যে কোন মুসীবতের সময় তাঁহারা নামাযে মশগুল হইয়া যাইতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) একবার সফরে ছিলেন। পথিমধ্যে সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার পুত্রের ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। তিনি উট হইতে নামিয়া দুই রাকআত নামায আদায় করিলেন, অতঃপর ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন পড়িলেন এবং বলিলেন, আমি তাহাই করিয়াছি যাহা আল্লাহ তায়ালা করিতে হুকুম করিয়াছেন। অতঃপর কুরআন পাকের আয়াত তেলাওয়াত করিলেন ঃ

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ (সূরা বাকারাহ, আয়াত ঃ ১৫৩)

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) কোথাও যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার ভাই কুছামের ইন্তেকালের খবর পাইলেন। রাস্তার এক পার্শ্বে যাইয়া উট হইতে নামিয়া দুই রাকআত নামায পড়িলেন এবং আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দোয়া করিতে থাকিলেন। তারপর উটে সওয়ার হইয়া কুরআন পাকের আয়াত তেলাওয়াত করিলেন ঃ

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ

(সূরা বাকারাহ, আয়াত ঃ ১৪৫)

আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহর সাহায্য হাসিল কর সবর ও নামাযের মাধ্যমে এবং নিঃসন্দেহে এই নামায অত্যন্ত কঠিন কাজ, তবে যাহাদের অন্তরে খুশু রহিয়াছে তাহাদের জন্য কঠিন নহে। খুশূর বিবরণ তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আসিতেছে।

তাহারই সম্পর্কে আরও একটি ঘটনা আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণের কোন একজনের ইন্তিকালের সংবাদ পাইয়া তিনি সেজদায় পড়িয়া গেলেন। একজন জিজ্ঞাসা করিল, ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে ইহাই বলিয়াছেন যে, যখন তোমরা কোন দুর্ঘটনা দেখ, তখন সেজদায় (অর্থাৎ নামাযে) মশগুল হইয়া যাও। উম্মুল মোমেনীনের ইন্তেকালের চাইতে বড় দুর্ঘটনা আর কি হইতে পারে। (আবূ দাউদ)

হযরত উবাদাহ (রাযিঃ)এর ইন্তেকালের সময় যখন নিকটবর্তী হইল, তখন তিনি উপস্থিত লোকদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের সকলকে আমার মৃত্যুর পর কান্নাকাটি করিতে নিষেধ করিতেছি। যখন আমার রূহ বাহির হইয়া যাইবে, তখন প্রত্যেকেই ওযূ করিবে এবং আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ওযূ করিবে। অতঃপর মসজিদে যাইবে এবং নামায পড়িয়া আমার জন্য আল্লাহর কাছে গোনাহ–মাফীর দোয়া করিবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা হুকুম করিয়াছেন—

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ (সূরা বাকারাহ, আয়াত ঃ ১৫৩)

অতঃপর তোমরা আমাকে কবরের গর্তে পৌছাইয়া দিবে।

হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ)এর স্বামী হযরত আব্দুর রহমান (রাযিঃ) অসুস্থ ছিলেন। একবার তিনি এমনই বেহুঁশ হইয়া পড়িলেন যে, সকলেই তাহার ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত করিল। হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ) উঠিলেন এবং নামাযের নিয়ত বাঁধিলেন। তিনি নামায হইতে ফারেগ হইলে হযরত আব্দুর রহমান (রাযিঃ) হুঁশ ফিরিয়া পাইলেন। লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার অবস্থা কি মৃত্যুর মত হইয়া গিয়াছিল? লোকেরা আরজ করিল, হাঁ। তিনি বলিলেন, দুইজন ফেরেশতা আমার নিকট আসিল এবং আমাকে বলিল, চল, আহকামুল হাকেমীনের দরবারে তোমার ফয়সালা হইবে। এই কথা বলিয়া তাঁহারা আমাকে লইয়া যাইতে লাগিল। এমন সময় তৃতীয় একজন ফেরেশতা আসিল এবং সেই দুইজনকে বলিল, তোমরা চলিয়া যাও, ইনি ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে একজন যাহাদের তকদীরে সৌভাগ্য ঐ সময়ই লিখিয়া

দেওয়া হইয়াছে যখন তাঁহারা মায়ের পেটে ছিলেন। এখনও তাঁহার দ্বারা তাঁহার সন্তানগণের আরও অনেক উপকার হাসিল করা বাকী রহিয়া গিয়াছে। ইহার পর হযরত আব্দুর রহমান (রাযিঃ) এক মাস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। অতঃপর ইন্তেকাল করেন। (দুররে মানসূর)

হযরত নযর (রাযিঃ) বলেন, একবার দিনের বেলায় ঘোর অন্ধকার হইয়া গেল। আমি দৌড়াইয়া হযরত আনাস (রাযিঃ)র খেদমতে হাজির হইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় কখনও কি এইরূপ অবস্থা হইয়াছে? তিনি বলিলেন, খোদার পানাহ! হুযূরের যমানায় তো সামান্য জোরে বাতাস বহিলেই আমরা মসজিদে দৌড়াইয়া যাইতাম আর মনে করিতাম, নাজানি কেয়ামত আসিয়া গেল। (আবূ দাউদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযিঃ) বলেন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরওয়ালাদের উপর কোন রকম অভাব-অনটন দেখা দিত, তখন তাহাদেরকে নামাযের হুকুম করিতেন এবং এই আয়াত তেলাওয়াত করিতেন ঃ

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ
نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ○ (سورة طٰهٰ - ع ٨)

অর্থাৎ (হে রাসূল) আপন ঘরওয়ালাদেরকে নামাযের হুকুম করিতে থাকুন এবং নিজেও উহার এহ্‌তেমাম করুন। আপনাকে রুজি উপার্জনে লাগাইতে চাই না; রুজি তো আপনাকে আমিই দিব।

(সূরা ত্বাহা, আয়াত ঃ ১৩২)

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, যখন কাহারও কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, উহা দ্বীনি প্রয়োজন হউক বা দুনিয়াবী; উহার সম্পর্ক আল্লাহ পাকের সাথে হউক বা কোন মানুষের সাথে হউক—তাহার উচিত যেন সে খুব ভাল করিয়া ওযূ করে অতঃপর দুই রাকআত নামায পড়ে। তারপর আল্লাহ তায়ালার হামদ ও ছানা পাঠ করে এবং দুরূদ শরীফ পড়ে। অতঃপর নিম্নবর্ণিত দোয়া করে—ইনশাআল্লাহ তাহার প্রয়োজন নিশ্চয়ই পূরা হইবে। দোয়া এই—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ۔ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔ أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ○

ওয়াহ্‌ব ইবনে মুনাব্বেহ (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজের প্রয়োজন নামাযের মাধ্যমে চাওয়াই নিয়ম। পূর্ববর্তী লোকগণের যখন কোন সমস্যা দেখা দিত, তখন তাহারা নামাযের দিকেই মনোনিবেশ করিতেন। যাহারই উপর কোন মুসীবত আসিত, তৎক্ষণাৎ নামাযের দিকে রুজূ হইতেন।

বর্ণিত আছে যে, কুফা নগরীতে একজন কুলি ছিল, যাহার উপর মানুষের খুব আস্থা ছিল। বিশ্বস্ত হওয়ার কারণে ব্যবসায়ীদের মালপত্র টাকা পয়সা ইত্যাদিও আনা-নেওয়া করিত। একবার সে সফরে যাইতেছিল। পথিমধ্যে একজন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাইতেছ? কুলি বলিল, অমুক শহরে। লোকটি বলিতে লাগিল, আমিও যাইব। আমার পক্ষে পায়ে হাঁটিয়া চলা সম্ভব হইলে তোমার সঙ্গে পায়ে হাঁটিয়াই চলিতাম। তোমার জন্য কি সম্ভব যে, এক দীনার ভাড়ার বিনিময়ে তুমি আমাকে খচ্চরে চড়াইয়া নিবে? কুলি ইহাতে রাজী হইল, লোকটি সওয়ার হইয়া গেল। পথিমধ্যে একটি দ্বিমুখী রাস্তা পড়িল। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, কোন্‌দিকে যাইতে চাও। কুলি সর্বসাধারণ লোক যে পথে চলে সেই পথের কথা বলিল। লোকটি বলিল, এই ভিন্নপথটি নিকটবর্তী হইবে এবং জানোয়ারটির জন্যও সুবিধাজনক হইবে। কারণ ইহাতে প্রচুর ঘাসের ব্যবস্থাও আছে। কুলি বলিল, আমি এই রাস্তা দেখি নাই। লোকটি বলিল, আমি বহুবার এই রাস্তা দিয়া চলিয়াছি। কুলি বলিল, আচ্ছা ঠিক আছে। তাহারা এই পথেই চলিতে লাগিল। কিছুদূর যাওয়ার পর রাস্তাটি একটি ভয়ানক জঙ্গলের মধ্যে শেষ হইয়া গেল এবং সেখানে অনেক লাশ পড়িয়াছিল। ঐ ব্যক্তি সওয়ারী হইতে নামিয়া কোমর হইতে খঞ্জর বাহির করিয়া কুলিকে কতল করিতে উদ্যত হইল। কুলি বলিল, এইরূপ করিও না। মালপত্র এবং খচ্চরই তোমার উদ্দেশ্য, কাজেই এইসব তুমি লইয়া যাও; আমাকে কতল করিও না। লোকটি কুলির এই কথা মানিল না বরং কসম খাইয়া বলিল যে, আগে তোমাকে মারিব অতঃপর এইসব লইব। কুলি অনেক অনুনয় বিনয় করিল, তথাপি ঐ জালেম কোন কিছুই মানিল না। কুলি বলিল, আচ্ছা আমাকে শেষ বারের মত দুই রাকআত নামায পড়িতে দাও। সে রাজী হইল এবং উপহাস করিয়া বলিল, জলদি পড়িয়া লও; এই মুর্দা লোকগুলিও এইরূপ আবেদন করিয়াছিল কিন্তু নামায তাহাদের কোন কাজে আসে নাই। কুলি নামায পড়িতে আরম্ভ করিল। আল-হামদু শরীফ পড়ার পর কোন সূরা তাহার মনে আসিতেছিল না। ঐ দিকে জালেম

দাঁড়াইয়া তাড়া দিতেছিল যে, জলদি নামায শেষ কর। এই দিকে মনের অজান্তেই কুলির জবান হইতে এই আয়াত বাহির হইল ঃ

أَمَّنْ يُّجِيبُ الْمُضْطَرَّ (সূরা নমল, আয়াত ঃ ৬২)

সে এই আয়াত পড়িতেছিল আর কাঁদিতেছিল। এমন সময় চকচকে লোহার টুপি পরিহিত একজন আরোহী সামনে আসিল। সে বর্শা মারিয়া সেই জালেম লোকটিকে হত্যা করিল এবং যেখানে লোকটি মরিয়া পড়িল, সেইখান হইতে আগুনের শিখা উঠিতে লাগিল। উক্ত নামাযী বে-এখতিয়ার সেজদায় পড়িয়া গেল। আল্লাহর শোকর আদায় করিল। নামাযের পর আরোহী ব্যক্তির দিকে দৌড়াইয়া গেল এবং জিজ্ঞাসা করিল, আল্লাহর ওয়াস্তে এইটুকু বলুন যে, আপনি কে? কিভাবে আসিলেন? আরোহী বলিল, আমি أَمَّنْ يُّجِيبُ الْمُضْطَرَّ এর গোলাম, এখন তুমি বিপদমুক্ত, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার। এই বলিয়া আরোহী চলিয়া গেল। (নুযহাতুল-মাজালিস)

প্রকৃতপক্ষে নামায এমনই বড় দৌলত যে, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ছাড়াও দুনিয়ার বহু মুসীবত হইতেও নাজাতের কারণ হয়। আর দিলের শান্তি তো লাভ হইয়াই থাকে।

ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, যদি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করা এবং দুই রাকআত নামায পড়ার মধ্যে অধিকার দেওয়া হয়, তবে আমি দুই রাকআত নামায পড়াকেই গ্রহণ করিব। কেননা, জান্নাতে প্রবেশ করা তো আমার নিজের খুশীর জন্য আর দুই রাকআত নামায হইল আমার মালিকের খুশীর জন্য। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ রহিয়াছে, বড়ই ঈর্ষার পাত্র ঐ মুসলমান, যে হালকা পাতলা হয় (অর্থাৎ যাহার পরিবার পরিজনের বোঝা কম হয়) আর যথেষ্ট পরিমাণে তাহার নামায পড়িবার সুযোগ হয়, জীবিকার ব্যবস্থা কোনরূপে জীবন-যাপনের মত হয়, আর উহারই উপর সবর করিয়া জীবন পার করিয়া দেয়, আল্লাহর এবাদত ভাল করিয়া করে, মানুষের নিকট অপরিচিত থাকে, শীঘ্র মৃত্যুবরণ করে, পরিত্যক্ত সম্পত্তিও বেশী নাই, কান্নাকাটি করার লোকও তেমন কেহ নাই। (জামে সগীর)

এক হাদীসে আসিয়াছে, নিজের ঘরে নামায বেশী করিয়া পড়, ঘরে খায়ের-বরকত বৃদ্ধি পাইবে। (জামে সগীর)

(٦) عَنْ اَبِىْ مُسْلِمِنِ التَّغْلَبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى اَبِىْ اُمَامَةَ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ يَا اَبَا اُمَامَةَ اِنَّ رَجُلًا حَدَّثَنِىْ مِنْكَ اَنَّكَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّاَ فَاَسْبَغَ الْوُضُوْءَ غَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهٗ وَمَسَحَ عَلٰى رَاْسِهٖ وَاُذُنَيْهِ ثُمَّ قَامَ اِلٰى صَلٰوةٍ مَّفْرُوْضَةٍ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مَا مَشَتْ اِلَيْهِ رِجْلَاهُ وَقَبَضَتْ عَلَيْهِ يَدَاهُ وَسَمِعَتْ اِلَيْهِ اُذُنَاهُ وَنَظَرَتْ اِلَيْهِ عَيْنَاهُ وَحَدَّثَ بِهٖ نَفْسُهٗ مِنْ سُوْءٍ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ سَمِعْتُهٗ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا۔

ابومسلم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوامامہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا وہ مسجد میں تشریف فرما تھے میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپکی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالی جل شانہ اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوتے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوتے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس نے آنکھوں سے کیا ہو، اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوتے ہوں سب کو معاف فرما دیتے ہیں، حضرت ابوامامہؓ نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دفعہ سنا ہے

(رواه احمد والغالب على سنده الحسن وتقدم له شواهد فى الوضوء كذا فى الترغيب قلت وقد روى معنى الحديث عن ابى امامة بطرق فى مجمع الزوائد)

(৬) আবু মুসলিম (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ)এর খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। আমি আরজ করিলাম যে, আমার নিকট এক ব্যক্তি আপনার পক্ষ হইতে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, আপনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে এই এরশাদ শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভালভাবে ওযূ করে অতঃপর ফরজ নামায পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তাহার ঐ দিনের ঐ সমস্ত গোনাহ যাহা চলাফেরার দ্বারা হইয়াছে, যাহা হাতের দ্বারা করিয়াছে, যাহা কানের দ্বারা হইয়াছে, যাহা চক্ষু দ্বারা করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত গোনাহ যেগুলির খেয়াল তাহার অন্তরে পয়দা হইয়াছে সবই মাফ

করিয়া দেন। হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি এই কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে কয়েক বার শুনিয়াছি। (তারগীব ঃ আহমদ)

ফায়দা ঃ এই বিষয়টিও কয়েকজন সাহাবী হইতে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন হযরত উসমান, হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত আনাস, হযরত আব্দুল্লাহ সুনাবিহী, হযরত আমর ইবনে আবাছাহ (রাযিঃ) প্রমুখ হইতে বিভিন্ন রেওয়ায়াতে শব্দের কিছুটা পার্থক্য সহ এই একই বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে।

যে সমস্ত বুযুর্গানে দ্বীনের কাশ্‌ফ হইয়া থাকে তাহারা গোনাহ দূর হইয়া যাওয়ার বিষয়টি অনুভবও করিয়া থাকেন। হযরত ইমাম আজম আবূ হানীফা (রহঃ)এর ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, ওযূর পানি ঝরার সময় তিনি বুঝিতেন যে, ইহার সহিত কোন্ গোনাহ ধুইয়া যাইতেছে।

হযরত উসমান (রাযিঃ)এর একটি রেওয়ায়াতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদও নকল করা হইয়াছে যে, কেহ যেন (নামায দ্বারা গোনাহ মাফ হইয়া যায়) এই কথার দ্বারা ধোকায় না পড়িয়া যায়। অর্থাৎ নামাযের দ্বারা গোনাহ মাফ হইয়া যাওয়ার উপর ভরসা করিয়া গোনাহে লিপ্ত হওয়ার দুঃসাহস যেন কেহ না করে। কেননা, আমাদের নামায ও অন্যান্য এবাদতের যে অবস্থা, সেইগুলি যদি আল্লাহ তায়ালা দয়া করিয়া কবূল করিয়া নেন, তবে উহা তাহার অসীম রহমত ও মেহেরবানী ছাড়া কিছুই নয়। নতুবা আমাদের এবাদতের অবস্থা তো আমরা নিজেরাই ভাল জানি। যদিও নামাযের মধ্যে এই শক্তি রহিয়াছে যে, ইহাতে গোনাহ মাফ হয়, কিন্তু আমাদের নামায সেই উপযুক্ত কিনা তাহা আল্লাহ পাকই জানেন। আরেকটি কথা এই যে, 'আমার মাওলা অসীম দয়ালু ও মেহেরবান ; তিনি আমাকে মাফ করিয়া দিবেন' এই কথা মনে করিয়া গোনাহ করা খুবই লজ্জার ব্যাপার। ইহা তো এমনই হইল যে, কোন ব্যক্তি নিজের পুত্রগণকে বলিল, যে কেহ অমুক কাজ করিবে আমি তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিব। নালায়েক পুত্রগণ পিতার মাফ করিয়া দেওয়ার কথা শুনিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে তাহার নাফরমানী করিতে লাগিল।

(৭) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَجُلَانِ مِنْ بَلِيٍّ حَيٍّ مِّنْ قُضَاعَةَ أَسْلَمَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتُشْهِدَ أَحَدُهُمَا

حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ کے دو صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے اُن میں سے ایک صاحب جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا ایک سال بعد انتقال

وَاُخِّرَ الْاٰخَرُ سَنَةً قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَرَأَيْتُ الْمُؤَخَّرَ مِنْهُمَا اُدْخِلَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الشَّهِيْدِ فَتَعَجَّبْتُ لِذٰلِكَ فَاَصْبَحْتُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلَيْسَ قَدْ صَامَ بَعْدَهٗ رَمَضَانَ وَصَلّٰى سِتَّةَ اٰلَافِ رَكْعَةٍ وَكَذَا وَكَذَا رَكْعَةً صَلٰوةَ سَنَةٍ۔

ہوا میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا تھا اُن شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گئے تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت اُونچا ہے وہ پہلے جنت میں داخل ہوتے۔ میں نے حضورؐ سے خود عرض کیا یا کسی اور نے عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن صاحب کا بعد میں انتقال ہوا انکی نیکیاں نہیں دیکھتے کتنی زیادہ ہو گئیں ایک رمضان المبارک کے پورے روزے بھی اُن کے زیادہ ہوتے اور چھ ہزار اور اتنی اتنی رکعتیں نماز کی ایک سال میں اُن کی بڑھ گئیں۔

(رواه احمد باسناد حسن ورواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه والبيهقي كلهم عن طلحة بنحوه اطول منه وزاد ابن ماجة وابن حبان في اٰخره فلما بينهما اطول ما بين السماء والارض كذا في الترغيب ولفظ احمد في النسخة التي بايدينا او كذا وكذا ركعة بلفظ او وفي الدر اخرجه مالك واحمد والنسائي وابن خزيمة والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الايمان عن عامر بن سعد قال سمعت سعدا وناسا من الصحابة يقولون كان رجلان اخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان احدهما افضل من الاٰخر فتوفي الذي هو افضلهما ثم عمر الاٰخر بعده اربعين ليلة الحديث وقد اخرج ابوداؤد بمعنى حديث الباب من حديث عبيد بن خالد بلفظ قتل احدهما ومات الاٰخر بعده بجمعة الحديث)

(৭) হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, এক গোত্রের দুইজন সাহাবী একসঙ্গে মুসলমান হইলেন। তাহাদের মধ্য হইতে একজন জেহাদে শহীদ হইয়া গেলেন আর দ্বিতীয় জন এক বৎসর পর মারা গেলেন। হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন যে, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যিনি এক বৎসর পর মারা গিয়াছিলেন তিনি সেই শহীদের আগেই জান্নাতে

প্রবেশ করিয়াছেন। ইহাতে আমি অত্যন্ত আশ্চর্যবোধ করিলাম যে, শহীদের মর্তবা তো অনেক উচুঁ ; তাহারই তো আগে জান্নাতে প্রবেশ করার কথা! এই বিষয়টি আমি নিজে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম কিংবা অন্য কেহ আরজ করিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, যে ব্যক্তি পরে মারা গিয়াছে, তোমরা কি তাহার নেকীসমূহ দেখিতে পাও না যে, তাহা কত বৃদ্ধি পাইয়াছে? এক বৎসরে তাহার পূর্ণ একটি রমযান মাসের রোযাও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ছয় হাজার রাকাতের অধিক নামাযও তাহার আমলনামায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। (তারগীব ঃ আহমদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান)

ফায়দা ঃ বৎসরের সব কয়টি মাসই যদি ঊনত্রিশ দিনের ধরা হয় এবং প্রতি দিনের শুধু ফরজ ও বিতরের নামায মিলাইয়া বিশ রাকআতেরই হিসাব করা হয়, তবু বৎসরে ছয় হাজার নয়শত ২০ রাকআত নামায হয়। আর যে সব মাস ত্রিশ দিনের হইবে প্রত্যেকটিতে বিশ রাকআত করিয়া বৃদ্ধি পাইবে। উহার সহিত যদি সুন্নত ও নফল নামাযসমূহকে গণনা করা হয়, তাহা হইলে তো আরও অনেক বৃদ্ধি পাইবে।

ইবনে মাজাহ শরীফে এই ঘটনাটি আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত তালহা (রাযিঃ) যিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন তিনি নিজে বর্ণনা করিতেছেন যে, একটি গোত্রের দুইজন লোক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে একসাথে হাজির হইলেন এবং একসাথেই তাহারা মুসলমান হইলেন। তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন অত্যন্ত উদ্যমী ও সাহসী। তিনি এক জেহাদে শহীদ হইয়া গেলেন। আর অপরজন এক বৎসর পর ইন্তেকাল করিলেন। আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ানো রহিয়াছি এবং ঐ দুইজন সাথীও সেখানে আছেন। এমন সময় ভিতর হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া ঐ ব্যক্তিকে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দিল যাহার এক বৎসর পর ইন্তেকাল হইয়াছিল আর শহীদ ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর আবার ভিতর হইতে একজন আসিয়া শহীদ ব্যক্তিকে ভিতরে যাইবার অনুমতি দিল। আর আমাকে বলিল, তোমার এখনও সময় হয় নাই ; তুমি ফিরিয়া যাও। পরদিন সকালে আমি লোকজনের নিকট স্বপ্নের আলোচনা করিলাম। সকলেই ইহাতে আশ্চর্য হইল যে, শহীদের অনুমতি পরে হইল কেন? তাহার তো আগেই অনুমতি হওয়া উচিত ছিল। লোকেরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া এই বিষয়টি আরজ করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কি

আছে! লোকেরা আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সে অত্যন্ত উদ্যমী ও সাহসী লোক ছিল এবং সে শহীদও হইয়াছে, অথচ অপরজন জান্নাতে তাহার আগে প্রবেশ করিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে আগে প্রবেশ করিয়াছে, সে কি এক বৎসরের এবাদত বেশী করে নাই? সকলেই বলিলেন, নিশ্চয়ই করিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিলেন, সে কি পূরা এক রমযান মাসের রোযা বেশী রাখে নাই? সকলেই বলিলেন, নিশ্চয়ই রাখিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বলিলেন, সে কি এক বৎসরে নামাযের মধ্যে এতো এতো সেজদা বেশী করে নাই? সকলেই উত্তর করিলেন, নিশ্চয়ই করিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তবে তো দুই জনের মধ্যে আসমান–যমীন পার্থক্য হইয়া গেল।

এই ধরণের ঘটনা আরও কয়েকজন সাহাবীর সহিত ঘটিয়াছে। আবূ দাঊদ শরীফে অন্য দুইজন সাহাবীর এই ধরণের ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহাদের মৃত্যুর ব্যবধান ছিল মাত্র আট দিন। দ্বিতীয় জনের ইন্তেকাল সাত দিন পর হওয়া সত্ত্বেও তিনি আগে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করেন। আসলে আমাদের ধারণাই নাই যে, নামায কত দামী জিনিস। ইহাতে অবশ্যই কোন তাৎপর্য রহিয়াছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার চোখের শীতলতা ও শান্তি নামাযের মধ্যে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখের শীতলতা ও শান্তি কোন মামুলী জিনিস নহে ; বরং তাহা পরম ভালবাসা ও মহব্বতেরই আলামত বুঝায়।

অন্য এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, দুই ভাই চল্লিশ দিনের ব্যবধানে ইন্তেকাল করেন। তাহাদের মধ্যে যিনি আগে মারা গিয়াছেন তিনি বুযুর্গ ছিলেন। এইজন্য লোকেরা তাহাকে প্রাধান্য দিতে লাগিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, দ্বিতীয় ভাই কি মুসলমান ছিলেন না? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, অবশ্যই মুসলমান ছিলেন, তবে সাধারণ পর্যায়ের ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, তোমাদের কি জানা আছে যে, চল্লিশ দিনের এবাদত উক্ত ব্যক্তিকে কোন্ পর্যায়ে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ নামাযের উদাহরণ হইল, একটি সুমিষ্ট ও গভীর নহরের মত, যাহা কাহারো বাড়ীর দরজার নিকট প্রবাহিত রহিয়াছে এবং সে উহাতে দৈনিক পাঁচবার করিয়া গোসল করিয়া থাকে, তবে তাহার শরীরে

—৬

কি কোন ময়লাই থাকিতে পারে? অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার এরশাদ ফরমাইলেন, তোমরা কি জান, তাহার ঐ সমস্ত নামায যাহা সে পরে পড়িয়াছে উহা তাহাকে কোন্ মর্যাদায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে।

(৮) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ يُبْعَثُ مُنَادٍ عِنْدَ حَضْرَةِ كُلِّ صَلٰوةٍ فَيَقُوْلُ يَا بَنِيْ اٰدَمَ قُوْمُوْا فَاَطْفِئُوْا مَا اَوْقَدْتُمْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَيَقُوْمُوْنَ فَيَتَطَهَّرُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ الظُّهْرَ فَيُغْفَرُ لَهُمْ مَا بَيْنَهُمَا فَاِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ فَمِثْلُ ذٰلِكَ فَاِذَا حَضَرَتِ الْمَغْرِبُ فَمِثْلُ ذٰلِكَ فَاِذَا حَضَرَتِ الْعَتَمَةُ فَمِثْلُ ذٰلِكَ فَيَنَامُوْنَ فَمُدْلِجٌ فِيْ خَيْرٍ وَمُدْلِجٌ فِيْ شَرٍّ (رواه الطبرانى فى الكبير كذا فى الترغيب)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے (گناہوں کی بدولت) اپنے اوپر جلانا شروع کردیا ہے بجھاؤ چنانچہ (دیندار لوگ) اٹھتے ہیں وضو کرتے ہیں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں جسکی وجہ سے انکے گناہوں کی (صبح سے ظہر تک کی) مغفرت کردیجاتی ہے اسی طرح پھر عصر کے وقت پھر مغرب کے وقت پھر عشاء کے وقت (غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے) عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہوجاتے ہیں اس کے بعد اندھیری میں بعض لوگ برائیوں (زنا کاری بدکاری چوری وغیرہ) کی طرف چل دیتے ہیں اور بعض لوگ بھلائیوں (نماز وظیفہ ذکر وغیرہ) کی طرف چلنے لگتے ہیں.

(৮) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যখন নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তখন একজন ফেরেশতা ঘোষণা করেন যে, হে আদমের সন্তানগণ! উঠ এবং জাহান্নামের যে আগুন তোমরা (নিজেদের গোনাহের কারণে) নিজেদের উপর জ্বালাইতে শুরু করিয়াছ তাহা নিভাও। অতএব (দ্বীনদার লোকেরা) উঠে, ওযূ করে এবং যোহরের নামায পড়ে। যদ্দরুণ তাহাদের (সকাল হইতে যোহর পর্যন্ত) গোনাহসমূহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে আছরের সময়, মাগরিবের সময়, এশার সময়, মোটকথা প্রত্যেক নামাযের সময় এরূপ হইতে থাকে। এশার নামাযের পর লোকজন ঘুমাইয়া পড়ে। অতঃপর অন্ধকারে কিছুসংখ্যক লোক মন্দ কাজে (অর্থাৎ জেনা, চুরি ও বিভিন্ন

অন্যায় কাজে) লিপ্ত হইয়া যায় আর কিছু সংখ্যক লোক সৎকাজে (অর্থাৎ নামায, ওজীফা ও যিকিরে) মশগুল হইয়া যায়। (তারগীব ঃ তাবারানী)

ফায়দা ঃ হাদীসের কিতাবসমূহে অধিক পরিমাণে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা মেহেরবাণী করিয়া নামাযের বদৌলতে গোনাহসমূহ মাফ করিয়া দেন। নামাযের ভিতরেই যেহেতু এস্তেগফার রহিয়াছে, তাই ছগীরা ও কবীরা উভয় প্রকার গোনা–ই মাফীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। তবে শর্ত এই যে, গোনাহের উপর আন্তরিকভাবে লজ্জিত হইতে হইবে। স্বয়ং আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۭ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۭ

(সূরা হুদ, আয়াত ঃ ১১৪)

৩নং হাদীসে এই বিষয়টি বর্ণনা করা হইয়াছে।

হযরত সালমান (রাযিঃ) একজন বড় মশহুর সাহাবী। তিনি বলেন, যখন এশার নামায শেষ হইয়া যায়, তখন সমস্ত মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। তন্মধ্যে এক দল যাহাদের জন্য এই রাত্রি নেয়ামত ও কল্যাণকর হয়, যাহারা এই রাত্রিকে নেকী উপার্জনের অপূর্ব সুযোগ বলিয়া মনে করেন। অতএব লোকেরা যখন আরাম আয়েশ ও ঘুমে বিভোর হইয়া থাকে, তখন ইহারা নামাযে মশগুল হইয়া যান। সুতরাং ইহা তাহাদের জন্য সওয়াব ও নেকীর রাত্র হইয়া যায়। দ্বিতীয় দল, যাহাদের জন্য রাত্র চরম মুসীবত ও আজাব স্বরূপ হয়। তাহারা রাত্রের নির্জনতা ও অবসরকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া বিভিন্ন গোনাহের কাজে মশগুল হইয়া যায়। সুতরাং তাহাদের রাত্র তাহাদের জন্য মুসীবত ও বরবাদীর কারণ হইয়া যায়। তৃতীয় দল, যাহারা এশার নামায পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়ে তাহাদের জন্য না মুসীবত, না উপার্জন, না কিছু গেল, না কিছু আসিল।

(দুররে মানসূর)

(৯) عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِنِّيْ افْتَرَضْتُ عَلٰى اُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوٰتٍ وَعَهِدْتُّ عِنْدِيْ عَهْدًا اَنَّهٗ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ اَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ

حضور کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اس کا میں نے اپنے لئے عہد کرلیا ہے کہ جو شخص ان پانچوں نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل